কোরআনে বিজ্ঞান



ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম

কোরআনে বিজ্ঞান

কোরআনে বিজ্ঞান

ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম

এম. বি. বি. এস. (কলিকাতা); ডি. সি. পি. (লন্ডন); ডি. প্যাথ. (ইংল্যান্ড);
এফ. আর. সি. প্যাথ. (ইংল্যান্ড); এফ. সি. পি. এস. (বাংলাদেশ)



জ্ঞান বিতরণী

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
জুলাই-২০১০

প্রচ্ছদ
সুব্রত সাহা

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস
জন্মভূমি কালার স্পট

মুদ্রণ
ধলেশ্বরী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৩৮ আর এম. দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
১২০ টাকা U.S.$-4.00

QURAN-E BIGGYAN (Science In Quran)
By Dr. M. Ghulam Muazzam
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 984-8747-80-X

উৎসর্গ

যাঁর আজীবন অকৃত্রিম স্নেহ মমতা, তত্ত্বাবধান ও শাসনের ফলে দ্বীন দুনিয়ার শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছি, যাঁর জীবনব্যাপী অনাড়ম্বর আদর্শ, ইসলামি জিন্দেগী আমাদের ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে আমরা উচ্চ শিক্ষালাভে সমর্থ হয়েছি, যাঁর দৈনন্দিন জীবন আমাদের জন্য রাহমানুর রাহীম আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের মূল উৎস, আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় আব্বার পবিত্র নামে এই 'কোরআনে বিজ্ঞান' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।

একান্ত স্নেহের—

মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম

প্রকাশকের কথা

পবিত্র কোরআন কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। এটা মহান আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য অবতীর্ণ সর্বশেষ হেদায়াত গ্রন্থ। ১৪০০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হলেও এ গ্রন্থ সর্বকালের মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত। আরবের উম্মী নবীর মারফতে এ হেদায়াত আমরা পেয়েছি। কোরআনের ভাষা, শব্দ চয়ন পদ্ধতি, উচ্চারণ পদ্ধতি, গ্রন্থনা পদ্ধতি এমন কি লিখন পদ্ধতিও আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হয়েছে। মানব জীবন বস্তুজগতের যতদিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আনুষঙ্গিকভাবে কোরআনে সবই বর্ণিত হয়েছে। আর তা হয়েছে আমাদের বস্তু-মস্তিষ্কের বুঝার জন্যই। এতে আনুষঙ্গিকভাবে বিজ্ঞানের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। 'কোরআনে বিজ্ঞান', গ্রন্থে লেখক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম, যা আজ পর্যন্তও অপরিবর্তনীয়ভাবে সংরক্ষিত আছে। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে কোরআনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা 'কোরআনে বিজ্ঞান' বইখানি প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আশা করি, এটা সংশয়বাদীদের সংশয় নিরসন করবে, আর জ্ঞানপিপাসু ঈমানদারদের ঈমানকে করবে বলিষ্ঠ ও মজবুত।

প্রকাশক

শুকরিয়া

এ গ্রন্থ প্রকাশ করার তৌফিক দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম রাহমানুর রাহীম সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া। গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেছি এ দেশের অসংখ্য ইসলামদরদী দ্বীনী ভাইদের নিকট থেকে। এ সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কোরআন শরীফের বর্তমান আলোচনার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রাজশাহীর বিখ্যাত আলেম আলহাজ মওলানা গোলাম মুস্তফা আমজাদী কাউসারী সাহেবকে পড়ে শুনিয়েছি। তিনি এ জন্য তাঁর অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন। এ পুস্তক প্রকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন এবং আন্তরিক দোআ করেছেন। তাই এ পরম ভক্তি-ভাজন ও সুসাহিত্যিক (উর্দু ভাষায় 'কাউসার' নামক কবি) মওলানা সাহেবকে আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। বাংলাভাষাকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য বন্ধুবর সাহিত্যিক জনাব অধ্যাপক আবু তালেব সাহেব শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিখানি পাঠ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, যার জন্য তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

পুস্তকটি ছাপানোর সম্পূর্ণ ভার এবং প্রুফ দেখার বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন আমার মাননীয় শ্বশুর সাহেব জনাব আলহাজ্জ আবুল কাসেম মুহাম্মাদ হুসেন বি. এ. (আরবি অনার্স)। তিনি বহু আয়াতের তরজমা শুদ্ধ করেছেন এবং এর আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধনও করেছেন। তাঁকে এ তকলীফ স্বীকার করার জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ, এ পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা করে গ্রন্থকারের নিকট লিখে জানালে কৃতার্থ হবো; ইন-শাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন করা হবে।

প্রথম সংস্করণ
রাজশাহী
১৯৬৬

মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম

গুজারেশ

আল্লাহর অসীম রহমতে "কোরআনে বিজ্ঞান" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হল। চাকুরি জীবনের ব্যস্ততা ও দেশ-বিদেশে কর্মস্থলের পরিবর্তনে এ গ্রন্থের বিশেষ পরিবর্ধন সম্ভব হল না। দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকল, যদিও প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। নবুয়তের চৌদ্দশ বর্ষে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, আর দ্বিতীয় সংস্করণ হিজরতের চৌদ্দশ বর্ষে ১৯৮০ সালে প্রকাশ করা হয়। বহু দিন পরে এর তৃতীয় সংস্করণ বের করা হল।

দ্বিতীয় সংস্করণ বেশ কয়েক বছর হল শেষ হয়ে গেছে। আশা করি তৃতীয় সংস্করণও সহৃদয় পাঠকদের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হবে। আল্লাহ তায়ালা আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন— এই মুনাজাত করি।

আরজগুজার
মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম
১২১, বড় মগবাজার
কাজী অফিস লেইন
ঢাকা ১৭, বাংলাদেশ

১৪০৬ হি.
১৯৮৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

মুকাদ্দামা

বর্তমান সময়ে তিনটি প্রধান মতবাদ পৃথিবীতে প্রচলিত আছে ঃ পুঁজিবাদ (Capitalism), সমাজবাদ (Communism) ও ইসলাম। প্রথমোক্ত দু'টি আজ দুনিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, আর ইসলাম অনেকটা নীরব ভূমিকা নিয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে। এ ছাড়া আর যে সমস্ত মতবাদ পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, সেগুলো এ তিনটির নানারূপ শাখা-প্রশাখা মাত্র, মৌলিক নয়। বর্তমানে ইসলামের ভূমিকা অনেকটা অস্পষ্ট ও দুর্বল, কিন্তু বিশ্ব-নেতৃত্বের সঙ্গত দাবি নিয়ে ইসলাম ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। যার বাস্তব প্রমাণ বিংশ শতাব্দীর আণবিক যুগে ইসলামের নামে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কয়েকটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, কিন্তু এ সব ইসলামী রাষ্ট্রেও যে আজ ইসলামী জীবনব্যবস্থা একটি জীবন্ত আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, তার জন্য দায়ী মুসলমানদের দুর্বলতা, অজ্ঞানতা ও অকর্মণ্যতা। এ ছাড়া সেসব দেশের গোটা শিক্ষিত সমাজের নিকট ইসলাম অপরিচিত না হলেও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অপরিচিত সন্দেহ নেই। ফলে সর্বস্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের দু'একটা বিষয়ের তালি দেয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলছে, যার পরিণতি খুবই দুঃখজনক। একথা আজ স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন, ১৪০০ বছর পূর্বে নাযিল করা কোরআনী জীবন-ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এর কোনোরূপ মৌলিক পরিবর্তন করা চলবে না কিন্তু এর জন্য চিরন্তন ও প্রাচীন ইসলামকে আধুনিক যুগের মানুষের উপযোগী করে পরিবেশন করতে হবে। ইসলামী নীতি, আদর্শ ও বিধানে যারা পরিবর্তন আনতে চান, তারা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত; কিন্তু নতুন ঢঙে, আধুনিক পরিভাষায় ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ব্যতিরেকে কামিয়াবী অসম্ভব।

আজ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতিতে চমকে উঠা মানুষ কোরআনী জীবন ব্যবস্থাকে এ যুগের জন্য অনুপযুক্ত বলে ভাবছে, তাই কোরআনের বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

'কোরআনে বিজ্ঞান' গ্রন্থের নাম শুনেই যেন কেউ মনে না করেন, আল্লাহ তায়ালা বুঝি বিজ্ঞান গ্রন্থরূপেই কোরআন মাজীদ নাযিল করেছেন। কোরআন

বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। যে সর্বাঙ্গীণ জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করে চললে মানুষ এ দুনিয়াতেই শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এবং আখেরাতে পাবে অফুরন্ত শান্তির জান্নাত, সেই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় হেদায়াতই পবিত্র কোরআন মাজীদ। বস্তুত আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষাই কোরআনের প্রধান লক্ষ্য, আর সেই শিক্ষা লাভের প্রয়োজনে দুনিয়াবী জীবনে যে যে বিষয়ে হেদায়াতের প্রয়োজন তাও কোরআনে নাযিল হয়েছে। তাই জীব-জগতের সৃষ্টি, মানব জন্মের ইতিহাস, জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, খাদ্যে, আদান-প্রদানে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারাম, এমন কি যৌন জীবন সম্পর্কেও আনুষঙ্গিকভাবে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুজগতের জ্ঞানই বিজ্ঞান। আমাদের বস্তু-মস্তিষ্কের বুঝার জন্যই কোরআনে বস্তুজগৎ তথা বিজ্ঞানের বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানেই কোরআনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক।

আমি কোরআনুল হাকিম থেকে সেই মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার কতগুলো উক্তি আমার বিবেক-বুদ্ধি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তিসহ এ গ্রন্থে পেশ করার কোশেশ করেছি মাত্র।

বলাবাহুল্য, কোরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে বুঝতে হলে প্রথমত কোরআন কি, অতঃপর কোরআনের পরিভাষার কতগুলো বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখা প্রয়োজন। যেমন– **এক** : কোরআনের পরিচয়, **দুই** : ইসলাম, **তিন** : সিরাতুল মুস্তাকিম, **চার** : মুত্তাকী, **পাঁচ** : মুমিন ও মুসলমান, **ছয়** : কাফের এবং **সাত** : মুনাফিক ইত্যাদি। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

এক : কোরআনের পরিচয় : কোরআন প্রচলিত কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো বিষয়ের গবেষণামূলক গ্রন্থের ন্যায় কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয়। প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আল্লাহ যুগে যুগে দেশে দেশে ইসলাম তথা আল্লাহর পছন্দকৃত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বহু নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। এঁরা সবাই নিজ নিজ গোষ্ঠী, জাতি বা এলাকার জন্য এসেছিলেন। সবশেষে আল্লাহ তায়ালা গোটা মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বসহ শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (স.)-কে আরবে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ তেইশ বছর কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি নবুয়তের দায়িত্ব পালন করে আরবে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র ও বাস্তব জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হন। এ সময়ের মধ্যে দ্বীন ইসলাম প্রচারে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজনীয় হেদায়াত, উপদেশ, সাবধানবাণী ও যুক্তি-তর্ক ইত্যাদিরূপে যে সমস্ত আয়াতে কারিমা আল্লাহ তায়ালা নবীজীর উপর নাযিল

করেছেন, তার হুবহু লিখিত রূপই এ কোরআন মাজীদ। যেহেতু নবী আরব ও তাঁর প্রথম উম্মতগণ আরব, তাই কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এ কোরআন মহানবী (স.)-এর জীবতকালেই হাজার হাজার লোকের কণ্ঠস্থ এবং লিখিত রূপেও রক্ষিত হয়। সরকারিভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় বর্তমান রূপ লাভ করে। সূরার দৈর্ঘ্য ও তরতীব ইত্যাদি অবিকল নবীজী যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন আজও তাই আছে। পৃথিবীতে কোরআনই একমাত্র ধর্মীয় মূল গ্রন্থ, যা আজও অবিকৃত, যার কোনো বিকল্প অনুলিপিও নেই। কোরআন পাকে আল্লাহ ঘোষণা করেছে, "(হে নবী) অবশ্য আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্য আমিই এর রক্ষক।" সুতরাং নিঃসন্দেহে কোরআন একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও সন্দেহমুক্ত দ্বীনী কিতাব।

দুই : ইসলাম : ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। কোরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন—اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ–"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান, ২য় রুকু)

অন্য কোনো মানব রচিত ধর্মপুস্তকে সেই ধর্মের কোনো নাম দেওয়া নেই, কারণ সেগুলো আল্লাহর অবিকৃত কিতাব নয়। কোরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত জীবনব্যবস্থাই ইসলাম। কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো বিধান ইসলামের অংশ হতে পারে না।

তিন : সিরাতুল মুস্তাকিম : সিরাতুল মুস্তাকিম অর্থাৎ সরল রাস্তা। কোরআনের প্রথম সূরায় (সূরা ফাতেহা) আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন, আমরা আল্লাহর নিকট কি দোয়া চাইবো। এরশাদ হচ্ছে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ– হে রব 'তুমি আমাদের সিরাতুল মুস্তাকিম' বা সরল রাস্তার হেদায়াত দাও"। সরল রাস্তার হেদায়াত চাওয়াই শ্রেষ্ঠ চাওয়া। আল্লাহর পছন্দকৃত রাস্তাই কোরআনের ভাষায় সিরাতুল মুস্তাকিম।

চার : মুত্তাকীর পরিচয় : সূরা ফাতেহার দোয়ার জবাবে যেন আল্লাহ বলছেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ البقره : ٢

এ সেই কিতাব যার মধ্যে কোনোই সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত স্বরূপ।
—(সূরা আল বাকারা : ২)

আমরা যে হেদায়াত চাই তার জবাবে আল্লাহ বলেছেন, 'এই নাও সকল সন্দেহমুক্ত কিতাব (কোরআন), যা মুত্তাকীদেরকে হেদায়াতে দেবে বা সরল রাস্তা দেখাবে। সুতরাং কোরআনী জীবনব্যবস্থাই সিরাতুল মুস্তাকীম।

কিন্তু কোরআন থেকে হেদায়াত পেতে হলে মুত্তাকী হতে হবে। পরবর্তী দোআয়াতে আল্লাহ মুত্তাকীর পরিচয় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝- البقر : ٣-

"(তারাই মুত্তাকী) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যা দান করা হয়েছে তা থেকে ব্যয় করে এবং যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল সে সবই বিশ্বাস করে এবং আখেরাতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।" — (সূরা আল বাকারা : ৩-৪)

এখানে মুত্তাকীর ছয়টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছয়টি গুণ-বিশিষ্ট লোকেরাই কেবল কোরআন থেকে হেদায়াত পাবে। সে ছয়টি গুণ নিম্নরূপ—

১। গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করা ঃ এখানে ইন্দ্রিয় শক্তির অতীত আল্লাহ্, ওহী, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, কেয়ামত ইত্যাদি বিষয় বুঝানো হচ্ছে। যুক্তিবাদী মন হয়ত রুখে উঠবে— 'এ কেমন অযৌক্তিক দাবী? যা দেখব না তা বিশ্বাস করবো কেন? এ দাবী অন্যায় অযৌক্তিক ', কিন্তু যারা যুক্তি ও চাক্ষুষ দেখার এতটা ভক্ত, তারা কি প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ না দেখে দুনিয়ার কিছুই বিশ্বাস করেন না? না দেখে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক মতবাদ আমরা সবাই বিশ্বাস করি। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ও জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি সব কিছুতেই অসংখ্য মতবাদ (theory) বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত নিজেরা প্রমাণ না করেই বিশ্বাস করেন। এটমের আকার, চন্দ্র-সূর্যের দূরত্ব, আলোর গতি, পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি ইত্যাদি কয়জন প্রমাণ করে বিশ্বাস করেছেন? তা ছাড়া দুনিয়ার সকলেই তার পিতার পরিচয় পেয়েছে মায়ের 'নাকেস' সাক্ষীর মাধ্যমে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে নয়। আর আমি দেখিনি বলে তা সত্য নয়, এও কোনো যুক্তির কথা নয়। আমাদের দেশের বহু লোক ইন্দোনেশিয়া বা অস্ট্রেলিয়া না দেখলেও তা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। যারা দেখেছেন তাদের

কথায় আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসী মহানবীর কথাও বিশ্বাস করতে হবে। মনে রাখা দরকার— গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করা হয় বলেই ঈমান বা বিশ্বাস (Faith) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি প্রত্যক্ষভাবে দেখা য়ায় তখন সে বস্তুতে বিশ্বাস না রাখার প্রশ্নই উঠে না, তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা Knowledge বলে। সুতরাং গায়েবে বিশ্বাস করার আহ্বান অবৈজ্ঞানিক নয়।

২। সালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা : সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠা বলতে বাহ্যিক নামায পড়া ছাড়াও নামাযের শিক্ষা বাস্তব জীবনে রূপায়িত করাও বুঝায়। নামাযের নিয়মানুবর্তিতা, নেতার হুকুম পালন, নেতার ভুল হলে সসম্মানে ভুল ধরে দেয়া ইত্যাদি শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাকেই সালাত কায়েম করা বুঝায়। নামায আদায় করা তার প্রাথমিক অংশমাত্র।

৩। আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা : সম্পদ আল্লাহর দান; এ দান আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে হবে। এতে মানুষ শিখবে ত্যাগ, দয়া, মহানুভবতা। আল্লাহর হেদায়াত পেতে হলে স্বার্থপর, লোভী ও সংকীর্ণমনা হলে চলবে না। নিজের অর্জিত ধনে অন্যেরও অধিকার আছে। এরূপ বিশ্বাস পোষণ করলে তবেই আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব। আল্লাহর দেওয়া সম্পদ দান করলেও সওয়াব, এ কত বড় মহানুভবতা।

৪। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাযিল করা পবিত্র কোরআনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা : যদি নবীকে বিশ্বাস করা হয়, তবেই তাঁর প্রতি নাযিল করা ওহীতেও বিশ্বাস আসবে। যে কোরআন হেদায়াতের চাবিকাঠি সেই কোরআনে দৃঢ় বিশ্বাস না রাখলে হেদায়াত পাওয়া কি করে সম্ভব হবে? অবশ্য কোরআনের কোনো কোনো অংশ সুবিধামত বিশ্বাস করে কোনো কোনো অংশ অবিশ্বাস করলে এই চতুর্থ শর্ত পূর্ণ হবে না। বিনাদ্বিধায় কোরআনকে আল্লাহর বাণী বলে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে।

৫। 'আপনার পূর্বে' বলতে শেষ নবীর পূর্ববর্তী অসংখ্য নবী-রাসূলের উপর নাযিল করা সকল কিতাব ও সহীফা বুঝায় : ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবীই এই ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। পূর্ববর্তী নবীরা কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা জাতির জন্য এসেছিলেন, আর কোরআন মাজীদ গোটা মানবজাতির নিকট অবতীর্ণ কিতাব, যাতে পূর্ববর্তী সকল নবীর শিক্ষার মূলনীতিগুলো বর্তমান। পূর্বের সকল নবীদের প্রতি নাযিল করা কিতাব বিশ্বাস করার অর্থ সেগুলোর অনুসরণ করা বুঝায় না। একে তো পূর্ববর্তী কোনো কিতাবই দুনিয়াতে অবিকৃত নেই, দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তীগুলো বিশ্বজনীনও ছিল না। তবুও এ বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এতে কোরআন নাযিল হওয়ার যৌক্তিকতা মিলে আর বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বীজও এতে নিহিত

রয়েছে। বিশ্বের কোনো জাতিই আল্লাহ কর্তৃক উপেক্ষিত নয়, কেউই আল্লাহর পছন্দকৃত (Chosen) জাতি নয়। সকলেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। কোরআনের পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর শিক্ষা নানা কারণে বিকৃত হয়ে যাওয়ায় নানা ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। কোরআন সবাইকে এক সূত্রে বাঁধতে চেষ্টা করে পৃথিবীতে একমাত্র মানবজাতির ভিত্তি স্থাপন করছে। ইসলাম কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। সুতরাং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা মুত্তাকী হওয়ার অন্যতম শর্ত। কোনো নতুন বাদশাহর আমলে যেমন পূর্ববর্তী বাদশাহদের হুকুম মানতে হয় না, তেমনি শেষ নবীর নবুয়তের পর পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়ত নাকচ হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে পূর্বে কোনো বাদশাহ বা নবীই ছিল না, এমন বিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন উঠে না।

৬। **আখেরাতে বিশ্বাস :** এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। দুনিয়ার যাবতীয় ভালমন্দ কাজের একদিন বিচার হবে এবং সেদিন স্বয়ং আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে, এ-বিশ্বাস না থাকলে মানুষ হেদায়াতের রাস্তায় থাকতে পারে না। সুতরাং আখেরাতের বিচার দিনের উপর নিশ্চিত ও স্থির বিশ্বাস রাখতে হবে।

এ ছয়টি শর্ত পূরণকারীগণই কোরআন মাজীদ থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে।

পাঁচ : মুমিন মুসলমান : যারা কালেমা তাইয়েবা পড়ে ও বিশ্বাস করে ইসলামে দাখিল হলেন তারাই মু'মিন বা বিশ্বাসী। এ যেন কোনো মিলিটারি দলে ভর্তি হওয়া মাত্র, কিন্তু মুমিন হওয়াই যথেষ্ট নয়— এবার মুমিনকে ইসলামের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ মানতে হবে। তাই কোরআনে যে আদেশ মুসলিমদের সাধারণভাবে দেয়া হয়েছে, তাদের জীবন সংশোধন করার জন্য সেগুলো আলোচনা শুরু হয়েছে— يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো) বলে। সুতরাং মুসলিম হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ মুমিন হওয়া।

যে মু'মিন তিনি সর্বকাজে ও চিন্তায় সর্বাবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ও রাসূল (স.)-এর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তিনিই মুসলিম। প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই পূর্ণ মুসলিম হবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ছয় : কাফের : কাফেরদের পরিচয় নিম্নের আয়াতে বেশ সহজেই পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

لَايُؤْمِنُوْنَ ۝ – البقرة : ٦

"যারা সত্য প্রত্যাখ্যান (কুফরী) করেছে তাদেরকে তুমি হে (মুহাম্মদ) সতর্ক কর আর না-ই কর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান তারা কখনই ঈমান আনবে না।" —(সূরা আল বাকারা : ৬)

ব

অর্থাৎ কাফের তারাই যারা কোরআনের আহ্বান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এ ধরনের লোক কোরআনের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতে রাজি নয়; বরং তারা চিরাচরিত ভ্রান্ত মতের বাইরে যে কোনো মতকেই বিনাদ্বিধায় প্রত্যাখ্যান এবং তার বিরোধিতা করে থাকে। এ ধরনের হঠকারীরা কোনো দিনই ঈমান আনে না। তাই আল্লাহতায়ালা আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ কাফের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলে দিচ্ছেন, এরা আর ঈমান আনবে না, এরা কাফের হয়ে গেছে। সত্যের আহ্বানের অন্ধ বিরোধীরাই সত্যিকার কাফের।

কেউ বলতে পারে, যদি স্বয়ং আল্লাহই ঘোষণা করেন, তারা আর ঈমান আনবে না, তবে তাদের দোষ কোথায়? কিন্তু এ যুক্তি ঠিক নয়, কারণ আল্লাহ তাদেরকে কাফের করেননি; বরং ওরা হেদায়াতের দাওয়াত এবং প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণ পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে কাফের হয়ে গেছে। গায়েবের মালিক আল্লাহ জানেন, এরা কোনো দিন ঈমান আনবে না। আবু জাহল ও আবু লাহাব যে শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেনি, এটাও কোরআনের মোজেযা।

জেনে রাখা দরকার, সকল কাফেরই মুসলিম তথা ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন। এদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে খুব হুশিয়ার থাকতে হবে।

এই কাফেরদের সম্বন্ধে আল্লাহ আরও বলেছেন—

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ع — البقرة : ٧

"আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর আবরণ পড়েছে এবং এদের জন্য কঠিন শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে।" —(সূরা আল বাকারা : ৭)

এই মোহরাঙ্কিত করার জন্য আল্লাহ দায়ী নন, কারণ তারা কাফের হয়ে গেছে বলেই মোহর করা হয়েছে— মোহর করায় কাফের হয়নি। মন ও কান হেদায়াতের বাণী থেকে মাহরুম হয়ে গেছে বলেই মোহারাঙ্কিত করা বলা হয়েছে।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রগুলো যথার্থ ব্যবহারের অভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যাকে চিকিৎসাবিদ্যায় বলা হয় Disease atrophy বা অব্যবহারজনিত ক্ষয়। এটি আল্লাহর সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম। তা ছাড়া কোনো ছাত্র সারা বছর শিক্ষক, অভিভাবক ও বন্ধু-বান্ধবের সকল আদেশ-উপদেশ ও শাস্তির ভয় উপেক্ষা করে যদি পড়াশুনা না করে এবং বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে একশ নম্বরের মধ্যে শূন্য পায়, তবে আপাতঃদৃষ্টিতে যদিও শিক্ষকই ছাত্রটিকে শূন্য দিয়েছেন, তবুও এর জন্য শিক্ষক সাহেব মোটেই দায়ী নন; বরং এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছেলেটি নিজে। তেমনিভাবে যদি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও হেদায়াত অনুধাবন করার জন্য হৃদয় ও কানকে ব্যবহার করা না হয়, তবে এগুলোর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ব্যবহারজনিত ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। এরূপ অধ্যাত্ম শক্তিহীন মন ও কান হেদায়াত গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং সে অবস্থাকেই এখানে মোহর করা বলা হয়েছে।

আর কুফরীর জন্য তাদের চোখেরও আধ্যাত্মিক শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনসমূহ আর তাদের চোখে ধরা পড়ে না। মনে হয় যেন তাদের চোখে ছানি পড়ে গেছে। ছানি (Cataract) পড়া চোখ বাহ্যতঃ চক্ষু হলেও তার দৃষ্টিশক্তি নেই।

সাত : মুনাফিক : যারা বাহ্যতঃ কোনো আদর্শে বিশ্বাস প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে এর বিরোধিতা করে, তারা সেই আদর্শের জন্য মুনাফিক। ইসলামের আন্দোলনেও এ মুনাফিক দল যথেষ্ট ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ৮ থেকে ২০ আয়াত পর্যন্ত এদের বিভিন্ন রূপের পরিচয় দিয়ে মু'মিন মুসলমানদের সাবধান করে দিয়েছে। কাফের প্রকাশ্য দুশমন, যার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া সহজ, কিন্তু মুনাফিক ঘরের শত্রু, তাই অধিক ক্ষতিকর। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন—

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ٥

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে; আল্লাহ সেই ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের মিথ্যা বলার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।" —(সূরা আল বাকারা : ১০)

অন্তরের এ রোগ আসলে আধ্যাত্মিক রোগ। হেদায়াতের পথ দেখানোর পরও তারা মুখে ঈমান এনেছে বলে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বেঈমানই রয়ে গেছে।

এমনিভাবে তারা তাদের অন্তরকে কলুষিত করায় এখন তা আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অন্তরেরও যে ব্যাধি হতে পারে, তা আজ মাত্র দু'শ বছর হলো বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু মানসিক ব্যাধির প্রথম উল্লেখ কোরআনেই পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর মুসলিম চিকিৎসক আর রাযী ও ইবনে সীনা বহু মানসিক রোগীর চিকিৎসা করে সফল হয়েছেন। মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানসিক ব্যাধি (psychic disease) বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আর আল্লাহ মুনাফিকদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন কথাও অযৌক্তিক নয়। এটি কাফের সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ও যুক্তিসহ দেখানো হয়েছে। শারীরিক রোগের ন্যায় মানসিক রোগেরও যদি উপযুক্ত চিকিৎসা করা না হয়, তবে সে রোগ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাবে। এটা আল্লাহরই বিধান। সুতরাং মুনাফিকরা যেহেতু তাদের আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা করে না, তাই তাদের রোগ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এতে আল্লাহকে দায়ী করা বাতুলতা।

উপরে বর্ণিত কোরআনের পরিভাষাগুলোর সম্যক পরিচয় লাভের পর কোরআন পাঠ করলে হেদায়াত লাভ সহজ হবে সন্দেহ নেই। বর্তমান পুস্তকে কোরআনের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আশা করি মু'মিনদেরকে প্রকৃত মুসলিম হতে সাহায্য করবে এবং কাফের ও মুনাফিকদেরকেও হেদায়াতলাভে উদ্বুদ্ধ করবে। অবশ্য কেবলমাত্র আল্লাহই হেদায়াতের মালিক, কারণ তিনিই মানুষের অন্তরের সংবাদ পূর্ণভাবে জ্ঞাত আছেন।

এ কিতাবে প্রত্যেক আয়াতের উপর ডান দিকে আরবিতে সূরার নম্বর ও আয়াতের নম্বর 'সূরা ঃ আয়াত' এই নিয়মে দেয়া আছে। আর আয়াতের শেষে বন্ধনীর মধ্যে সূরার নাম, পারা ও রুকুর নম্বর দেয়া হয়েছে। আরবী আয়াতের নীচেই বড় অক্ষরে আয়াতের বাংলা তরজমা দেয়া হয়েছে। যার শেষে বন্ধনীর ভিতর বাংলায় সূরার নাম, পারা ও রুকুর নম্বর দেয়া হয়েছে। যেসব বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা দরকার, তরজমার সেই অংশের পাশে ক্রমিক নম্বর দেয়া হয়েছে। সেই ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পর পর নিচে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ের ক্রমিক নম্বর পৃথকভাবে শুরু হয়েছে।

কোরআনের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীতে বহু ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত রয়েছে। অনেকে পবিত্র কোরআনকে এমনি অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই ধরে নেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। নানা কারণে আল-কোরআন অন্য সমস্ত তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ। নিম্নে কোরআনের কয়েকটি বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হচ্ছে।

এক : কোরআন একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা মানব রচিত নয় বা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা লিখিত নয়। কোরআন আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিল করা, যা হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.); এর নিকট পৌঁছিয়েছেন এবং মহানবী সেই নাযিলকৃত আয়াতগুলো হুবহু পাঠ করে শুনিয়েছেন। এক কথায়, কোরআন আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং উন্নত আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন, আর নবীজী শুধু সেই আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট প্রকাশ করেছেন। প্রমাণস্বরূপ হাদীস শরীফে নবীজির নিজস্ব ভাষার তুলনায় কোরআনের ভাষা অনেক উন্নত এবং আজও কোরআন আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, কোরআনের বিভিন্ন সূরার নাম, দৈর্ঘ্য ও ক্রমবিন্যাস সবই আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈল (আ.) মারফত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে নবীজি বা অন্য কোনো মানুষের কোনো হাত নেই।

তৌরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, বেদ, উপনিষদ, ত্রিপিটক ইত্যাদি যাবতীয় গ্রন্থই মানব রচিত। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর ওহীর আলোকে নিজের ভাষায় তৌরাত লেখেছেন। এমনিভাবে দাউদ (আ.) যবুর কিতাব লেখেছেন। এ দু'টো কিতাবের নির্ভরযোগ্য কোনো কপি পৃথিবীতে নেই। পরবর্তীকালে ইহুদী পণ্ডিতগণ এ দুই কিতাবের যা কিছু উদ্ধার করে শ্রুতি ও স্মৃতির উপর নির্ভর করে লেখেছেন সেটাই বর্তমান Old Testament বা ইহুদী বাইবেল বা পুরাতন নিয়ম। হযরত ঈসা (আ,)-এর উপর ইঞ্জিল কিতাব নাযিল হয়, কিন্তু এর কোনো নির্ভরযোগ্য কপি পৃথিবীতে মওজুদ নেই। যদিও ঈসা (আ.)-এর

জনৈক সাথী সাধু বার্নাবাস হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণী ও জীবন ইতিহাস নবীর জীবতকাল থেকেই লেখতে শুরু করেন এবং নবীর অন্তর্ধানের পর শেষ করেন— সেই কিতাব— Gospel of st. Barnabas— বর্তমান খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিত্যক্ত। হযর ইসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের বহু বছর পর (এক থেকে দু'শত বছর) চার জন পাদ্রী বিভিন্ন সময় চারটি পৃথক Gospel লেখেন, যার সমষ্টি বর্তমান বাইবেলের প্রাচীনতম নমুনা। এ বাইবেল সর্বপ্রথম গ্রীক ভাষায় লেখা হয়, অথচ হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতৃভাষা ছিল এরামিক। মোটকথা, একমাত্র কোরআনই নির্ভরযোগ্য এবং অবিকৃত ঐশীবাণী, আর বাকী সকল ধর্মগ্রন্থই মানব রচিত। তাছাড়া এদের অনেকগুলো— বিশেষ করে বাইবেল বহুবার সঙ্কলিত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে।

দুই : কোরআন একমাত্র গ্রন্থ, যার ভাষা ও সাহিত্য আজ প্রায় চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে অপরিবর্তিত অবস্থায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা এবং মাপকাঠি হিসেবে সমগ্র আরব জগতে স্বীকৃত। প্রাচীন ধর্মীয় ভাষা হিব্রু, ল্যাটিন ও সংস্কৃত যদিও ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আজও ব্যবহৃত, তবুও তাদের বর্তমান সাহিত্য এতটা পরিবর্তিত যে, ধর্মীয় পুস্তক বুঝতে হলে সেসব প্রাচীন ভাষা নতুন করে শিখতে হয়। এ ছাড়া এগুলো কোথাও কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিসেবে চালু নেই, সেসব ভাষা এখন কেবল সিনাগগ, চার্চ ও মন্দিরের পুরোহিতগণই ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ এগুলো এখন মৃত ভাষা- Dead language অথচ আরবী বর্তমানে অনেকগুলো আধুনিক রাষ্ট্রের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা। কোরআন আজও আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং কোরআনের ভাষা বর্তমান আরবী ভাষাভাষীদের বোধগম্য। কোরআন মানব রচিত নয় বলে কোরআনেই উল্লেখ রয়েছে এবং মানবজাতিকে কোরআনের সূরার অনুরূপ একটিমাত্র সুরা রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জও দেয়া হয়েছে। আজ চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জ জারি রয়েছে। বর্তমানে বহু রাষ্ট্র আরবীতে রাষ্ট্রীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আজকে আরবী জাতিসংঘের স্বীকৃত অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা।

ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি ভাষাও এত বদলেছে যে, প্রাচীন ইংরেজি ও প্রাচীন বাংলা দস্তরমতো আলাদা ভাষা। এগুলো বুঝতে হলে নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। হিব্রু, ল্যাটিন ও সংস্কৃতের মতো প্রাচীন বাংলা এবং প্রাচীন ইংরেজি (চর্যাপদের বাংলা আর সেকসপিয়রের ইংরেজি) ও মৃত ভাষা এবং এসবই এখন গ্রীক, রোমান, মিসরীয় ও ভারতীয় সভ্যতার মতো যাদুঘরের সম্পদ, আর আরবী ভাষা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক যুগের উপযোগী।

কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যা আজ পর্যন্ত অবিকৃত এবং একে কোনোকালেই সংশোধিত ও সংকলিত করতে হয়নি। এ ব্যাপারে অন্য যে কোনো ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে কোনোরূপ তুলনার প্রশ্নই উঠে না। কারণ সে সবই যুগে যুগে এত পরিবর্তিত হয়েছে, যাতে আজ তাদের সত্যতাই সন্দেহের বিষয়। আর নিরক্ষর নবীর মুখ-নিঃসৃত আল-কোরআন বিশ্বের প্রায় শত কোটি মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা এবং সমগ্র আরব জাতির জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা। কোরআনের বদৌলতে আরবী ভাষা অপরিবর্তিত থাকতে পেরেছে এবং প্রত্যেকটি আরব রাষ্ট্র আরবীকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে, এমন কি অর্ধেক জনগোষ্ঠী খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও লেবাননের রাষ্ট্র ভাষা পর্যন্ত আরবি।

তিন : কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যার মধ্যে এ কিতাবের অনুসারীদের নাম ও তাদের অনুসৃত ধর্মের নাম স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী ইত্যাদি নাম পরবির্তীকালে মানুষের দেয়া, এগুলো তাদের ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। এগুলো অনেকটা মার্কসিস্ট, লেনিনিস্ট, মাওয়িস্ট জাতীয় নাম।

চার : কোরআন বিশ্বের সবচেয়ে অধিক পঠিত গ্রন্থ। 'কোরআন' শব্দের অর্থই হল পাঠ করার বিষয়। দিনে পাঁচবার সালাতের সময় প্রত্যেক মুসলমানকেই কোরআনের অংশবিশেষ পড়তে হয়। এছাড়া বহু মুসলমান প্রতিদিন কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করে থাকেন। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ এত ব্যাপকভাবে তার অনুসারিগণ কর্তৃক পাঠ করার নজির নেই।

পাঁচ : কোরআন একমাত্র বিশাল গ্রন্থ যা মানুষ হুবহু কণ্ঠস্থ করতে সক্ষম। এ 'হিফজ' (কণ্ঠস্থ) করার ব্যবস্থা কোরআন অবিকৃত রাখায় সাহায্য করেছে। আজ বিশ্বে লক্ষ লক্ষ 'হাফেজ' রয়েছেন, যারা না দেখে সমগ্র কোরআন মুখস্থ আবৃত্তি করতে সক্ষম। আরও বিস্ময়ের বিষয়, লাখ লাখ অনারব মুসলমান—আবাল-বৃদ্ধবনিতা এ কোরআন কণ্ঠস্থ করতে সক্ষম। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের বেলায় এমনটি দাবী করা যাবে না।

ছয় : কোরআন মহানবীর চিরস্থায়ী মোজেযা। পূর্ববর্তী সকল নবীর মোজেযা কেবলমাত্র তাঁদের জীবিতকালেই দেখানো সম্ভব ছিল। এখন আর কারো পক্ষে সেসব মোজেযার একটাও দেখানো সম্ভব নয়। হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেযাগুলোর একটাও আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ইহুদী জাতি দেখাতে

পারবে না, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর মোজেযাগুলোও বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নেতৃত্বের দাবীদার খ্রিস্টান জাতিসমূহ দেখাতে অক্ষম। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ, পূর্ববর্তী সকল নবী কোনো নির্দিষ্ট জাতি এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছিলেন; সুতরাং তাঁদের বিস্ময়কর মোজেযাগুলোও ছিল সেই সময়ের প্রয়োজনে। তাই আজ যেহেতু সেই নবীদের নবুয়ত নেই, সেহেতু তাঁদের কোনো মোজেযাও বাকি নেই। আর যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বশেষ নবী এবং তাঁর নবুয়ত চিরকাল কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ মোজেযাও কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। আর সেই শ্রেষ্ঠ মোজেযাই হল আল-কোরআন। আল-কোরআন চিরস্থায়ী নবুয়তের চিরস্থায়ী মোজেযা।

মহানবী ছিলেন নিরক্ষর বা উম্মী। কোনো সময় কোনো উম্মী ব্যক্তি কর্তৃক তার মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনার ইতিহাস নেই। অথচ মহানবীর মারফত আল্লাহ তায়ালা আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 'আল-কোরআন' নাযিল করেন যা সর্বকালের জন্য এক মহান মোজেযা। কোরআন যে স্বয়ং আল্লাহর রচনা, একথা ঘোষণা করে অবিশ্বাসীদের কোরআনের একটি ক্ষুদ্রতম সূরার মতো একটি সূরা হলেও রচনা করার জন্যে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। আজও সেই চ্যালেঞ্জ অপরিবর্তিত রয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, মহানবী (স.)-এর জীবতকালে আরবী সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল, তাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযাও ছিল কোরআনী সাহিত্য। তাঁর দেশবাসী জানতো তিনি নিরক্ষর। কবিতা রচনা বা সাহিত্য রচনায় তাঁর কোনোই বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাই তারা কোরআনের ভাষা, অলঙ্কার, শব্দবিন্যাস, ব্যাকরণ, লালিত্য ও প্রকাশ ভঙ্গির চমৎকারিত্বে অবাক হতো এবং কোরআনের আয়াতগুলো তন্ময় হয়ে শুনতো।

সাত : যেহেতু কোরআনে আল্লাহর কথা সরাসরি প্রথম পুরুষের ভাষ্যে বর্ণিত, তাই এতে মহানবীকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আবার মানব-জাতিকেও সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। কোরআন পড়লেই বুঝা যায়, এ গ্রন্থ মহানবীর রচনা হতে পারে না; বরং এটা তাঁর প্রতিও নির্দেশমাত্র। তাই তিনি শুধু নবীই নন— 'রাসূল' বা প্রেরিত পুরুষও বটে।

আট : কোরআন একটি পূর্ণ পুস্তক হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি। নবীজির ২৩ বছরের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে যখন যে নির্দেশের প্রয়োজন হয়েছে তখন

সেই অনুযায়ী কোরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। প্রত্যেক সূরার নাম ও কোনো আয়াত বা আয়াতাংশ কোনো সূরার কোনো আয়াতের পর পাঠ করতে হবে, সে নির্দেশও আল্লাহ নবীকে দিতেন এবং তিনিও সে অনুযায়ী পাঠ করতেন, আর সাহাবারাও সেভাবে মুখস্থ করতেন ও কয়েকজন লেখক সেগুলো নবীজির তদারকে লেখেও রাখতেন।

নয় : যখন কাগজ, ছাপাখানা, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি কিছুই ছিল না, সে সময় নাযিল করা এতবড় গ্রন্থ আজ সারা বিশ্বে অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান, এর চেয়ে বিস্ময়কর কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সারা বিশ্বে এ কোরআনের ব্যাপারে কোনো মতভেদ বা ভিন্নরূপ রচনা নেই। এ বিষয়ে একটি হরফেরও হেরফের নেই। এটাও কোরআনের আর এক চমৎকার মোজেযা।

বর্তমান শতাব্দীতে ড. রাশাদ খলিফা* কম্পিউটারের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা প্রকাশ করেছেন। তাঁর গবেষণার ফল এত বিস্ময়কর, তা যে কোনো নিরপেক্ষ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং কোরআনের বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ গ্রন্থের শেষাংশে এ সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা বিস্তারিত আলোচনাসহ প্রকাশ করা হয়েছে।

---

* ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এ গবেষণা চালানো হয় এবং এর ফলাফল সর্বত্র প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে।

কোরআনে বিজ্ঞান শিক্ষার তাকিদ

١٦٤ : ٢ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص
وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۝ (سورة البقرة پ ٢- رکوع ۴)

২ ঃ ১৬৪— নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে[১] রাত দিনের পরিবর্তনে[২] মানুষের লাভজনক দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে ভাসমান জলযানসমূহে[৩] আকাশ থেকে আল্লাহ যে (বৃষ্টির) পানি বর্ষণ করেন সে পানিতে মৃতপ্রায় পৃথিবীর পুনর্জীবনপ্রাপ্তিতে[৪], সেই পৃথিবীতে সকল প্রকার জীবজন্তুকে বিক্ষিপ্ত করাতে[৫], বায়ু প্রবাহে[৬], এবং আসমান ও জমিনের মধ্যে মেঘমালাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে রাখত[৭], বুদ্ধিমান লোকদের[৮] জন্য নির্দশনসমূহ নিহিত রয়েছে।

(সূরা বাকারা, ২য় পারা, ৪র্থ রুকু)

১। এ আয়াতে কতগুলো অতি পরিচিত প্রাকৃতিক বিষয়ের অবতারণা করে দেখানো হয়েছে, এর সব কটিই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রথমেই বলা হচ্ছে, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। পৃথিবী ও আসমানের সৃষ্টি সম্পর্কে যত মতবাদ (theory)-ই পেশ করা হোক না কেন, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই, এ কোনো মানুষের সৃষ্টি নয়; বরং কোনো পরম জ্ঞানী ও

কুশলীর সৃষ্টি। সেই পরম শক্তিকেই ইসলাম আল্লাহ বলে অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ-ই এ পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। আসমানসমূহ বলার উদ্দেশ্য পরবর্তী কোনো আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে এ দু'টি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

২। রাত-দিনের পরিবর্তনের কথা কোরআন মাজীদের আরও বহু জায়গায় বলা হয়েছে। এ প্রাকৃতিক নিয়মটিও আল্লাহরই কুদরত এবং এতেও মানুষের কোনো হাত নেই। দিবা-রাতের পরিবর্তনের পূর্ণ রহস্য আজও মানুষ সম্পূর্ণ জানতে পারেনি।

৩। আজকের রকেট ও স্পুটনিকের যুগেও মানুষের জীবন ধারণের ও সভ্যতা বজায় রাখার জন্য যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, তার বেশির ভাগই সামুদ্রিক জলযানের (নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদির) উপর নির্ভরশীল। সমুদ্রের মধ্যে এ জলযানগুলোর নিরাপদে যাতায়াত একান্তই আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করছে। আরবের অভ্যন্তরে উটের সওয়ারীতে অভ্যস্ত নবীজির মাধ্যমে আমরা এ সত্য জানতে পেরেছি। জলযানের এ প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোরআনের কথা যে কেবল আরবের জন্য নয়, এ আয়াতাংশ তার এক সুন্দর নিদর্শন।

৪। বৃষ্টির পানি আল্লাহর আর এক বিস্ময়কর কুদরত। মানুষ আজও পানির জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। কৃত্রিম বৃষ্টিতে আকাশের পানির প্রয়োজন ফুরাবে না। তা ছাড়া বড় বড় বাঁধ ও খাল কেটে মরুভূমিকে আবাদ করার জন্য যে নদীর পানি ব্যবহৃত হয়, তাও আল্লাহর দান বৃষ্টিরই ফল, মানুষের সৃষ্টি নয়। বৃষ্টির পানিতে কিরূপে মৃতপ্রায় পৃথিবী নতুন করে সজীব হয়ে উঠে, ভরে উঠে সবুজ গাছপালায়, তা সবারই জানা কথা। পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকায় আজও শস্য উৎপাদন একমাত্র বৃষ্টি বা বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল।

৫। বৃষ্টির পানির সহজলভ্যতার প্রভাবে কোনো এলাকা বেশি উর্বর আর কোনো জায়গা অনুর্বর বা মরুভূমি। মানুষ এসব কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থান পরিবর্তন করে। আজকাল অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় বহু কোটি লোকের বাস, কিন্তু কয়েকশ বছর পূর্বে এগুলো প্রায় জনশূন্য ছিল। এমনিভাবে জন্তু জানোয়ারও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সব দেশে মানুষ ও বিভিন্ন জীবজন্তু ছড়িয়ে থাকার মধ্যেও আল্লাহর এক বিস্ময়কর কুদরত প্রকাশ পাচ্ছে। কলম্বাসের আবিষ্কারের পূর্বে কি করে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা বসতি স্থাপন করল অথবা অস্ট্রেলিয়ার মাওরী জাতি কোথা থেকে এলো, এগুলো আজও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বিষয়।

৬। বায়ু প্রবাহ যে কোনো জায়গার আবহাওয়ার জন্য দায়ী। মওসুমী বায়ু আমাদের দেশের প্রাণস্বরূপ। সমুদ্রে নাবিকরা এই বায়ু প্রবাহের প্রভাব খুব ভাল

করেই উপলব্ধি করে। আধুনিক যন্ত্র ও রাডার নিয়ন্ত্রিত জাহাজ আবিষ্কারের পরও বায়ু প্রবাহের প্রভাব বিশেষ ক্ষুণ্ন হয়নি এবং এ বায়ু প্রবাহ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। একই বায়ু কোনো জায়গায় আনে জীবনদাত্রী বৃষ্টি, আবার অন্যত্র ঝড়, সাইক্লোন ও টাইফুনের মাধ্যমে আনে ধ্বংস। আজকের উন্নত আবহাওয়াবিশারদগণ বড়জোর একটু আগে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দিতে পারেন, কিন্তু তা রোধ করতে পারেন না। এ দেশের অধিবাসীরা ঝড়ের তাণ্ডব লীলা প্রায় প্রতি বছরই উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে আসছে। আজও এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে এবং কোরআন সে দিকেই ইঙ্গিত করছে।

৭। মেঘমালাও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, এর উপর মানুষের কোনো প্রভাব খাটে না। মেঘ সৃষ্টি, এর সঞ্চালন, এর প্রভাব ইত্যাদি আজও আবহাওয়া-বিশারদদের গবেষণার বিষয় এবং কোরআন সে দিকেই আহ্বান জানাচ্ছে।

৮। এ আয়াতে বর্ণিত সাতটি বিষয়ই প্রতিদিন আমাদের চারদিকে ঘটছে এবং সবারই চোখের সামনে উপস্থিত। এসব অতি সাধারণ (?) বিষয়ের দিকে আল্লাহ বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এসবই বস্তুজগতের ব্যাপার আর বস্তুজগতের জ্ঞানই বিজ্ঞান। সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষা করা ও এসব বিষয়ে গবেষণা করা আল্লাহরই নির্দেশ। কোরআনের এ শিক্ষা যেদিন মুসলমানরা বাস্তবে গ্রহণ করেছিল, সেদিন তারা পৃথিবীতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে গোটা মানবজাতির শিক্ষাদাতা হতে পেরেছিল। যে দিন প্রাচুর্যের অহঙ্কারে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দিয়ে ভোগ-বিলাস ও তথাকথিত ললিতকলা বা Fine arts-এর সেবা প্রাধান্য পেল, সেদিন থেকেই মুসলমানদের পতনের সূত্রপাত এবং ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনে নেমে এলো পরাধীনতা ও হীনমন্যতার ঘোর অমানিশা। সুতরাং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন যেমন ফরজ তেমনি বিজ্ঞানচর্চাও তাঁর নির্দেশ, আর এটা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাজ। আজ আমি এ আয়াতের শিক্ষার দিকে সমগ্র মুসলিম জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বস্তুজগতে উন্নতি একান্ত প্রয়োজন, নতুবা কাফের-মুশরিক শক্তির মোকাবিলায় নিজস্ব স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা করে পরকালের পাথেয় অর্জন সম্ভব নয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া আখেরাতের কর্মক্ষেত্র।

১৯. ৩ : إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

۱۹۱ : ۳ ــ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥

(سورة ال عمران ــ پ ــ ركوع ۱۱)

৩ ঃ ১৯০— নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবারাতের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

৩ ঃ ১৯১— যারা দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসে থেকে অথবা শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে[১০], এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে, হে আমার রব! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি অতি মহান; সুতরাং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা কর"। —(সূরা আলে ইমরান, ৪র্থ পারা ১১শ রুকু)

৯। সূরা বাকারার ১৬৪তম আয়াতের ১ ও ২ নং টীকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে জ্ঞানী লোকদের বিজ্ঞান গবেষণার আহ্বান জানান হচ্ছে।

১০। এ আয়াতে জ্ঞানী লোকের পরিচয় দেয়া হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা গবেষণা করেন এবং আল্লাহর কুদরতের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহর গুণগান করেন এবং আল্লাহকে অস্বীকার করার মহাপাপ থেকে আত্মরক্ষা করেন। কেবল স্বল্প জ্ঞানের লোকেরাই আল্লাহকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে।

একই বিষয় ৬ ঃ ৯৯ এবং ১০ ঃ ৬ আয়াতেও বলা হয়েছে।

۲:۱۳ ــ اَللهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ٥

١٣:٣ــ وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ
وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشِى الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٥
١٣:٤ ــ وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ
اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى
بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ط
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ٥

(سورة الرعد ــ پ١٣ ــ ركوع ۷)

১৩ ঃ ২ তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহকে খুঁটি[১১] ছাড়া স্থাপিত করেছেন যেন তোমরা দেখতে পার। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যে নিয়োজিত করেন। প্রত্যেকটি তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে[১২] নির্দিষ্ট সময়ে ঘুরে। তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি (এভাবে) নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন যেন তোমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে পার, তোমাদের রবের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ[১৩] হবে।

১৩ ঃ ৩— এবং তিনিই পৃথিবীকে[১৪] প্রসারিত করেছেন এবং তাতে পাহাড়[১৫] স্থাপন করেছেন ও নদীসমূহ[১৬] প্রবাহিত করেছেন। তিনি জোড়ায় জোড়ায়[১৭] নানারূপ ফল সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে[১৮] পরদার মত দিনের উপর টেনে দেন। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।

১৩ ঃ ৪— পৃথিবীতে বহু জমিন, আঙ্গুর বাগান ও শস্যক্ষেত্র এবং খেজুর বৃক্ষ রয়েছে, যা একটি বা বহু শিকড় থেকে উৎপন্ন, যদিও সবই একই পানি

দ্বারা সিঞ্চিত, তবুও কোনো ফলকে অন্যান্য ফল থেকে বেশি[২০] সুস্বাদু করেছি। নিশ্চয়ই এগুলোতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নির্দশনসমূহ রয়েছে।

—(সূরা রাদ, ১৩শ পারা, ৭ম রুকু)

১১। আসমান পৃথিবীর চারদিকে চাঁদোয়ার মত অবস্থান করছে, অথচ তার কোনো খুটি নেই। যারা আসমানকে শূন্যস্থান বলে দাবি করে তাদের মনে রাখা উচিত, আসমান কত দূরে বিজ্ঞান আজও তা বলতে অক্ষম। আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন— "পৃথিবীর আসমানকে আমি তারকা রাজি দ্বারা সজ্জিত করেছি," (৩৮ ঃ ৬)। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। তারাগুলো প্রত্যেকটি একেকটি সূর্যের মতো, যার আলো উপরোক্ত গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এবং কোটি কোটি বছর ধরে ধাবিত হয়েও নাকি কোনো কোনো তারার আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়নি। এ তারার রাজ্য প্রথম আসমান অবস্থিত। সুতরাং এ আসমান পৃথিবী থেকে যে কত কোটি কোটি আলো বছর (Light year) দূরে তা মানুষের কল্পনারও বাইরে। গ্যাগারিন, টিটভ প্রভৃতি নভোচারী মাত্র দেড় দুইশ মাইল উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। সুতরাং আসমান নেই বলার কোনো অধিকার এদের নেই। তারার রাজ্যে গিয়ে তবে দেখতে হবে আসমান কি জিনিস। সুতরাং আসমানকে কেবল শূন্যস্থান বলে দাবি করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। কোরআন বলে, আসমান একটি নয়, সাতটি ছাদ রয়েছে যা বিনা খুঁটিতে কেবল আল্লাহর কুদরতে মহাশূন্যে অবস্থান করছে। এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

১২। সূর্য ও চাঁদ নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে-এ বৈজ্ঞানিক সত্য মাত্র অল্পদিন পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে; অথচ আরবের নিরক্ষর নবী মারফত প্রেরিত কোরআনে এ সত্য ঘোষিত হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে। ১৪ ঃ ৩৩ আয়াতে একথা বলা হয়েছে—

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

গ্যালিলিও যখন বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়, তখন তিনি একথা জানতেন না, সূর্যও তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরছে। পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিকগণ একথা বুঝতে পারেন।

১৩। এ সমস্ত প্রাকৃতিক বিষয় ও বস্তু সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। এগুলো নিয়ে গবেষণা করলে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হবে এবং তাতে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস আসবে যার

অন্যতম প্রধান বিষয় আখেরাতের বিচার দিনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। সেদিন আল্লাহর সঙ্গে সবারই দেখা হবে। তখন সকল কৃতকর্মের জবাবদিহিও করতে হবে।

১৪। পৃথিবী কোনো ক্ষুদ্র জায়গা নয়। বড় বড় সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত হয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে এ বিরাট পৃথিবী। এ বিস্তৃত পৃথিবীও আল্লাহরই সৃষ্টি, এতেও মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই।

১৫। পাহাড়গুলো অন্যতম বিস্ময়কর জিনিস। কোথাও সমতল ভূমি; আবার কোথাও সু-উচ্চ পর্বতমালা, এ ব্যবস্থাও আল্লাহর; এর উপরও মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই।

১৬। নদ-নদীগুলো কখন কোনো স্থান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাও মানুষের বুদ্ধির অগম্য। নদীর বিচিত্র গতিপথ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ ছোট ছোট নদীর বেলায় সামান্য রদ-বদল করার চেষ্টা করলেও নদীর প্রবাহ মানব ক্ষমতার অতীত। কোথাও নদী-নালা না দিয়ে মরুভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে; আবার সেই মরুর বুকে মরূদ্যান ফল্গু নদীও আল্লাহর আশ্চর্য কুদরত। এসব বিষয়েই চিন্ত াশীলদের চিন্তা গবেষণা করা উচিত।

১৭। দুনিয়ার যত জীব-জন্তু, জীবাণু, গাছপালা পশুপক্ষী আবিষ্কার হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলোতেই পুরুষ ও নারী প্রকৃতির সন্ধান মেলে। কোথাও তা দৃশ্যমান আবার কোথাও অদৃশ্য। ফলের বেলায়ও তাই। ফুলের পুরুষ ও স্ত্রী রেণুর আবিষ্কার বেশি দিনের কথা নয়। পুংকেশর ও গর্ভকেশরের মিলনেই ফলের সৃষ্টি। ফলের সৃষ্টিতে এই জোড়ার আবিষ্কার হবার বহু শত বছর পূর্বেই কোরআনে একথা বলা হয়েছে। যদি কোনো গাছে কেবল পুরুষ ফুল থাকে তবে ফল হয় না।

১৮। দিনের শেষে রাতের অন্ধকার খুব ধীরে ধীরে হয়ে থাকে, যেন কেউ একটি কালো পর্দা অতি সন্তর্পণে টেনে দিচ্ছে। এ রাতের আগমনকে আল্লাহ এখানে কাব্যের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। রাতের আগমন সত্যিই পর্দা টেনে দেয়ার মতো আর প্রভাত পর্দা গুটিয়ে নেয়ার মতো। কি চমৎকার উদাহরণ ও বর্ণনা বৈশিষ্ট্য।

১৯। প্রকৃতি তথা সৃষ্টির বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, এগুলো নিয়ে চিন্তাশীল তথা গবেষকদের গবেষণা চালানো উচিত। তাই বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা আল্লাহর হুকুম। অবশ্য কেবল চিন্তাশীলদের পক্ষেই এরূপ চিন্তা গবেষণা সম্ভব। প্রকৃত চিন্তাশীল সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা না করে পারে না।

২০। একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত একই মাটিতে উৎপন্ন এক জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন গাছের ফসলের বা ফলের স্বাদ বিভিন্ন। এগুলো নিয়ে Soil Science বিভাগ আজকাল গবেষণা করছে। আল্লাহ্ বুদ্ধিমানদের এ বিষয়ে গবেষণা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। একই মাটি ও পানিতে বিভিন্ন স্বাদের ফল যে কেন হয় তা মানুষ সম্পূর্ণ জানে না, কিন্তু তা আল্লাহর কুদরত এবং গবেষণার বিষয় সন্দেহ নেই।

١٣ : ١٥ ــ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ○

٢٣ : ١٥ ــ وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ج وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ○

(سورة الحجر ــ پ ١ ــ ركو ع٢)

১৫ ঃ ১৬— আমিই আকাশের রাশিচক্রগুলো[২১] সৃষ্টি করেছি এবং তাদের দর্শকদের জন্য সুসজ্জিত করেছিল।

১৫ ঃ ২২— আমি গর্ভদানকারী বাতাস[২২] প্রবাহিত করি এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি; ফলে তোমরা প্রচুর[২৩] পানি পাও। তোমরা এত পানি জমা করে রাখতে সক্ষম ছিলে না। —(সূরা হিজর, ১৪শ পারা, ২য় রুকু)

২১। আসমানের রাশিচক্র জ্যোতির্বিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো মানুষের সৃষ্ট নয় এবং আজ পর্যন্ত এসব সম্বন্ধে মানুষ যা জানে তা যথেষ্ট নয়। এগুলো নিয়ে আরও গবেষণার সুযোগ কোনো দিন শেষ হবে না। আকাশের তারার রাজ্য আজও মানুষের কল্পনার বাইরে। মুসলিম জ্যোতির্বিদদের উচিত এ বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা। যাদের নবী আল্লাহর রহমতে সাত আসমান ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেছেন, সেই মুসলমানরা আজ রুশ আমেরিকার রকেট অভিযানে অবাক হবে কেন? তারা যে আরও এগিয়ে যাবে।

তারকারাজি পরিষ্কার আকাশে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তা কে অস্বীকার করবে? এসব দেখেও কি মানুষ এদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহতে বিশ্বাস করবে না? সত্যিই কি সুন্দর আল্লাহর সৃষ্টি

২২। পুরুষ ফুলের পুংরেণু বাতাসে উড়ে স্ত্রী ফুলের 'ডিম্বের' সঙ্গে মিলিত হলে বীজ ও ফলের উৎপত্তি হয়। বাতাসের এ কার্যক্রমের কথা বিজ্ঞান এই সেদিন মাত্র আবিষ্কার করলো, কিন্তু পবিত্র কোরআন তেরশ' বছর পূর্বে একথা ঘোষণা করেছে। আজ উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা (Botanists) স্বীকার করেছেন, 'শুক্রাণু' 'ডিম্বানু'র মিলন ঘটাতে বাতাস পানি, মৌমাছি ইত্যাদির সাহায্যের প্রয়োজন। অথচ এ আয়াতে আমরা এসব জানতে পারলাম নিরক্ষর আরব নবী (স.)-এর মুখ থেকে। উদ্ভিদজগতেও যে পুরুষ ও স্ত্রী বলে দু'টো ভাগ আছে একথা বিজ্ঞান অল্পদিন হল আবিষ্কার করেছে; আর গাছের যে প্রাণ আছে তা তো আবিষ্কার হলো মাত্র এই বিংশ শতাব্দীতে। অথচ কোরআন যাবতীয় জিনিসই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে বলে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই ঘোষণা করেছে (১৩ ঃ ৩) এবং বৃষ্টির পানিতে যে গাছপালা নবজীবন লাভ করে তাও কত সুন্দর করে বর্ণনা করেছে (২ ঃ ১৬৪)। কোরআন সত্যিই আল্লাহর কালাম, তাই এ সমস্ত আয়াত যে কোনো সংশয়বাদীর সংশয় দূর করতে পারে, অবশ্য যদি কেউ সংশয় দূর করতে ইচ্ছুক হয়।

২৩। এ বিষয়ে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ৫ নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١٢ : ١٢ ـــ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط
وَالنُّجُومُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّعْقِلُوْنَ٥ (سورة النحل ـــ پ ١٤ـــ ركوع ٨)

১৬ ঃ ১২— আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন রাতে, দিন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে তাঁরই আদেশে। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে[২৪]।—(সূরা নাহল, ১৪শ পারা, ৮ম রুকু)

২৪। এ সবগুলোই আল্লাহ মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। রাতের বিশ্রাম ও ঠাণ্ডার আমেজ, দিনের বেলায় সূর্যের আলো ও সম্পদ আহরণের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ, চাঁদের নৈঃসর্গিক প্রভাব ও স্নিগ্ধকর কিরণ, তারকার দিগনির্ণয় ও রাশিচক্রের সৃষ্টি ইত্যাদি সবই মানুষের উপকারে নিয়োজিত। তাই

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা ইত্যাদি মানুষের দাস, এরা কখনই মানুষের পূজ্য হতে পারে না। এসব থেকে মানুষ যত খুশি খেদমত তথা উপকার আদায় করুক তাতে কোনোদিন অভাব সৃষ্টি হবে না। উপকার দেয়া না দেয়া এসবের এখতিয়ারভুক্ত নয়, কারণ এরা আল্লাহর হুকুমে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত। যেহেতু এগুলো মানব নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তাই কিছু লোক এদের শক্তিশালী মনে করে পূজা করছে, কিন্তু যে কোনো বুদ্ধিমান লোকই বুঝতে পারে, এদের কোনো স্বকীয় ক্ষমতাই নেই, এরা আল্লাহর আদেশের দাস মাত্র।

١٦ : ٦٦ ـ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِى بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشّٰرِبِيْنَ٥

١٦ : ٦٧ ـ وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ٥

(سورة النحل ـ پ ١ـ ركوع ١٥)

১৬ ঃ ৬৬— এবং নিশ্চয়ই চতুষ্পদ হালাল প্রাণীর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিখার বিষয় রয়েছে। আমি এদের শরীর থেকে তাদের মলমূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী[২৫] বস্তু থেকে পবিত্র দুধ তৈরি করি, যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।

১৬ ঃ ৬৭— আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা পানীয়[২৬] ও উত্তম খাদ্যবস্তু[২৭] লাভ কর। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।—(সূরা নহল, ১৪ পারা, ১৫শ রুকু)

২৫। গরু-বকরী ইত্যাদি কতগুলো চতুষ্পদ প্রাণীর (الانعام) দুধ মানুষের জন্য এক অপূর্ব নেয়ামত। এ দুধ কি করে সৃষ্টি হয় সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যই এ আয়াতের আলোচ্য বিষয়। বলা হয়েছে, দুধ প্রাণীর মলমূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থা থেকে সৃষ্ট। কথাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক, যদিও বিজ্ঞান এ জ্ঞান অর্জন করেছে কোরআন নাযিলের প্রায় ১২০০ বছর পর। গরু, মহিষ, উট, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি দুধ প্রদানকারী ঘাস ও তৃণলতাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের পরিপাকযন্ত্রে হজম হয়। খাদ্যের পরিত্যাজ্য বস্তুগুলো মল বা গোবর হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। গ্রহণযোগ্য বস্তুগুলো অন্ত্র থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্ত শরীরের সকল জীবকোষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ

করে এবং কোষ থেকে দূষিত পদার্থ গ্রহণ করে প্রশ্বাস ও মূত্রের মাধ্যমে পরিত্যাগ করে। সুতরাং পুষ্টিকর বস্তুগুলো রক্তে প্রবাহিত হয়। যে সমস্ত গ্রন্থি (যেমন দুধের বাঁট, পিটুইটারী) দুধ সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে, সেগুলোর জীবকোষসমূহ তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো রক্তের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে! এমনিভাবে দুধের মাখন, চিনি, ভিটামিন, প্রোটিন ইত্যাদি রক্ত দ্বারা সরবরাহ করা হয়। রক্তের এ বস্তুগুলো খাদ্য থেকে আসে, তা থেকে মল মূত্র পরিত্যক্ত হয় আর রক্ত দুধের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে সেসব গ্রন্থি থেকে চলে যায়। সুতরাং মলমূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থা থেকেই দুধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কত সুন্দর করে এবং কত সংক্ষেপে আল্লাহ এ কুদরতের বর্ণনা দিলেন। কোরআনের এ ধরনের আয়াত বৈজ্ঞানিকদের আরও গবেষণার প্রেরণা দেবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এ গূঢ় বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে নিরক্ষর নবীর উপর নাযিল করা কোরআনে সর্বপ্রথম উদঘাটিত হয়। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষকে বস্তুজগতে বহু বিষয়ের, অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন যা কোরআনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২৬। এখানে আল্লাহ তার সৃষ্ট বিভিন্ন ফলের ব্যবহার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন যদিও এখানে আরবের দু'টি প্রধান ফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। سكر শব্দ দ্বারা কেউ কেউ শুধু মদ বুঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু তা নয়; এতে শরবতও বুঝানো হচ্ছে। খেজুর, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল থেকে যেমন নেশাকর মদ তৈরি হয়, তেমনি তাতে নেশাহীন শরবতও হতে পারে। আল্লাহ যা সত্য তাই বলেছেন, এতে মদ হালাল হয় না, কারণ মদ হারাম করে পরিষ্কার আয়াত নাযিল হয়েছে।

২৭। এ সমস্ত ফল থেকে যে খাদ্য হয় তা অতি পুষ্টিকর। যেহেতু এসব ফল থেকে মদ্য জাতীয় পানীয়ও তৈরি হয়। তাই سكر শব্দের সঙ্গে حسن বা উত্তম শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, অথচ খাদ্যের বেলায় حسن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সে যাই হোক, দুধ ও বিভিন্ন ফলে তৈরি পানীয় খাদ্যবস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে যে কোনো বুদ্ধিমান লোক আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে হেদায়াত পেতে পারে।

২৭ : ١٦ــ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ٥

(سورة النحل ــ پ ا ــ ركوع ١٢)

১৬ ঃ ৭৯— তারা (অবিশ্বাসীগণ) কি দেখে না, পাখি আকাশের শূন্যমার্গে স্থির হয়ে উড়ে বেড়ায়? তাদেরকে আল্লাহরই এভাবে ধরে রেখেছেন আর কেউ নয়। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনসমূহ[২৮] রয়েছে।

—(সূরা নহল, ১৪শ পারা, ১৭শ রুকু)

২৮। আল্লাহ কাফের মুশরিকদেরকে বুঝাবার জন্য যুক্তি ও বহু প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, যা সবার চোখের উপর নিত্যই ঘটছে এবং যা খুঁজে বেড়াতে হয় না। এখানে পাখির আকাশে উড়ার ক্ষমতার কথা হচ্ছে। যদিও পাখি ডানা নেড়ে উড়ে, কিন্তু অনেক পাখি অনেক সময় ডানা দু'টো প্রায় স্থির রেখে আকাশে ভেসে বেড়ায়। এদের এ ক্ষমতা আল্লাহই দিয়েছেন। আজ মানুষ বহু যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক সম্পদ ব্যয় করে যদিও আকাশে উড়তে সক্ষম হয়েছে, তবুও তা পাখির মতো এত সহজ সাবলীল ও বিপদ মুক্ত নয়। কত সাধারণ বিষয় দিয়ে উদাহরণ দেয়া হলো। পাখির উড়া দেখেই মানুষ উড়ার বাসনা করে, যার পরিণতি বর্তমান উড়োজাহাজ ও রকেট।

যারা আল্লাহর শক্তি ও অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা কি ক্ষুদ্র পাখিরই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করে না? যাদের অন্তরে বিশ্বাস ও যুক্তির আলো নেই, তারা এসব দেখেও দেখে না বা বুঝতে সক্ষম হয় না। যে কোনো বুদ্ধিমান ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য পাখির উড়ার ক্ষমতা আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য ও অস্তিত্ব বুঝার নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট।

۴ : ۱۷ ـ سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

(سورة بنى اسرائيل ـ پ ۱۵ ـ ركوع ۱)

১৭ ঃ ১— মহামহিমান্বিত সে আল্লাহ! যিনি তাঁর দাসকে[২৯] রাতে ভ্রমণে নিয়েছিলেন সম্মানিত মসজিদ[৩০] থেকে দূরতম মসজিদ[৩১] পর্যন্ত, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমি বরকত দিয়েছেন তাকে আমি আমার নির্দশনসমূহ[৩২] দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি অতি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।

—(সূরা বনী-ইসরাঈল, ১৫শ পারা, ১ম রুকু)

২৯। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে উদ্দেশ্য করেই দাস শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র কালেমাতেও তাঁকে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ বলা হয়েছে। অনেক নবীকে তাঁদের অনুসারীগণ স্বয়ং খোদা, খোদার অবতার বা খোদার পুত্র ইত্যাদি মিথ্যা স্তুতিবাদে অভিহিত করেছে। যাতে শেষ নবীকেও এ ধরনের ভুল খেতাব দেয়ার সুযোগ না হয় বা মর্যাদায় বাড়াবাড়ি করা না হয়, সে জন্য স্পষ্ট করে মহানবীকে আল্লাহর দাস ও প্রেরিত পুরুষ বলা হয়েছে। এ মানুষ-নবী মানবের মর্যাদা আকাশচুম্বী করে দিয়েছেন। খোদার পুত্র বা খোদার অবতার দ্বারা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি তো হয়ই না বরং তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও 'অতি-মানব' (?) মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ হতে পারে না। কারণ তাদের উপদেশাবলী মানুষের সুখ দুঃখ ও সামর্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। তাই এসব কল্পিত খোদার পুত্র ও অবতারদের তথাকথিত অনুসরণকারীগণ তাদের অবতার বা লর্ডকে মানুষ থেকে বহু দূরে সরিয়ে রেখে, পাটে বসিয়ে বা মূর্তি গড়ে পূজা-ই করে থাকে, কিন্তু তাদেরকে অনুসরণ করার কল্পনাও করে না।

৩০। সকল মসজিদই সম্মানিত, কিন্তু اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বা 'সম্মানিত মসজিদ' বলতে একমাত্র কা'বা শরীফকেই বুঝায়।

৩১। দূরতম মসজিদ (اَلْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى) বলতে জেরুজালেমে অবস্থিত প্রথম কেবলা হযরত সুলায়মান (আঃ) নির্মিত মসজিদ (Dome of the Rock)-কেই ধরা হয় এবং সে জন্য সেই মসজিদকে 'মসজিদুল আকসা' বলা হয়। এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অন্যতম মোজেযা মিরাজ সম্পর্কে বিখ্যাত বিবরণ। মিরাজের পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এ অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে কাফেররা তা হেসেই উড়িয়ে দেয়। মহানবী আসমানে যাবার পথে জেরুজালেমের মসজিদে থেমে গিয়েছেন বলায় কাফেররা তাঁর সত্যতা যাচাই করার সুযোগ পায়। তারা নবীজীকে জেরুজালেমের মসজিদ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে সঠিক উত্তর পায়। এসব কারণে কোরআনের اَلْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى দ্বারা জেরুজালেমের বায়তুল মাকদেস ধরা হয়েছে। অবশ্য মাসজিদুল আকসা থেকে আসমানে আরোহণ করে সিদরাতুল মুনতাহা ছেড়ে আরও উর্ধ্বে আরোহণ করে মহানবী যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন সে বিবরণ সুরা নাজমে (৫৩ ঃ ৭-১৮ আয়াতে) বর্ণিত হয়েছে।

৩২। এখন প্রশ্ন, মিরাজ কেন হল; আর মানুষের জন্য এরূপ আকাশ ভ্রমণ সম্ভব কিনা?

যিনি আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দুনিয়াবাসীকে হেদায়াত করবেন তাঁর পক্ষে পরকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আর যাঁর প্রতিনিধিত্ব তিনি করবেন তাঁর কাছ থেকে সরাসরি দায়িত্বলাভ ও প্রয়োজনীয় বিশেষ উপদেশ গ্রহণও আবশ্যক। এ পর্যন্ত আল্লাহর ফেরেশতা মারফত তিনি নির্দেশাবলী পেয়েছেন আর মিরাজের মাধ্যমে তিনি সরাসরি তার কর্তব্যভার পূর্ণভাবে লাভ করেন। মিরাজের পরই হিজরত ও বহু যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হবে, যার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহর বহু নিদর্শন রাসূলুল্লাহ (স.) মিরাজের সময় স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। সেসব যদি কেবল জেরুজালেমে সম্ভব হতো তা মক্কা শরীফেও সম্ভব হতো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স.) বায়তুল মাকদেস ও বায়তুল মামুর হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা ছাড়িয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন, কোরআন (৫৩ ঃ ৭-১৮) হাদীসে স্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন, মানুষের পক্ষে রাতের স্বল্প সময়ের মধ্যে এত দূরে ভ্রমণ করে ফিরে আসা সম্ভব কিনা? যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সেরূপ অলৌকিক কাজই তো মোজেযা। যা মানুষের কল্পনারও বাইরে তাই আল্লাহর কুদরতে সম্ভব। হযরত জিবরাঈল (আ.) দিনে বহুবার মহানবীর নিকট পয়গাম নিয়ে এসেছেন, আর শ্রেষ্ঠ মানব কেন একবার তা পারবেন না। হাঁ, এ সম্ভব হয়েছে পরম জ্ঞানী ও শক্তিমালী, আকাশসমূহ এবং মহাশূন্যের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কুদরতে ও হুকুমে।

আজ মানুষ মহাশূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং চাঁদে গিয়ে পৌছেছে, শীঘ্রই তারা মঙ্গল গ্রহে যাবার নিশ্চিত আশা রাখে। মানুষ এ পর্যন্ত ২০০/২৫০ মাইল উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে এবং প্রায় আধা ঘণ্টার জন্য মহাশূন্যে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর নবী শূন্য হাতে মানুষের তৈরি কোনোরূপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোটি কোটি আলোর বছরের দূরত্ব অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করেছেন। রকেট আবিষ্কারের পর মি'রাজ কিছুটা বোধগম্য হচ্ছে। বিজ্ঞান যত বেশি উন্নতি করবে, কোরআনের বহু কথা তখন আরও ভাল করে বুঝা সম্ভব হবে। হাদীস শরীফে 'বোরাক' চড়ে যাওয়ার কথাও বেশ উল্লেখযোগ্য। আরবি برق অর্থ বিদ্যুৎ। 'বোরাক' বিদ্যুৎ জাতীয় কোনো অতি গতিশীল বাহন ছিল বলে মনে হয়।

এ পর্যন্ত আকাশ ভ্রমণ মানুষের জন্য খুব সহজ ও নিরাপদ নয়। আমার মনে হয় মানুষ চেষ্টা করলে এ বিষয়ে আরও উন্নতি করা সম্ভব এবং কোরআন সে দিকে বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের ইঙ্গিত করছে।

মনে রাখা দরকার, কোরআনের কোনো আয়াত বুঝতে না পারলে তা সম-সাময়িক বিজ্ঞানের সীমিত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা অন্যায়। সেসব বিষয় ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানীদের জন্য বাকি রইল। এমনি ভাবে কোরআন যুগে যুগে মানুষকে উন্নতির পথে প্রেরণা যোগাবে।

٩ : ٣ ــ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ۝

٥٠ : ٢ ــ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

(سورة طه ــ پ ١٦ ــ ركوع ١١)

২০ ঃ ৪৯— (মূসা ও হারুনের বাণী শুনে ফেরাউন) বলল, "হে মূসা, কে তোমার 'রব'* (প্রতিপালক)?"

২০ ঃ ৫০— তিনি বললেন, "আমাদের 'রব' তিনিই যিনি প্রত্যেক জিনিসকে দিয়েছেন তাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং দেখিয়েছেন তাদের পথ"[৩৩]।

(সূরা ত্ব-হা, ১৬শ পারা, ১১শ রুকু)

৩৩। এখানে আল্লাহর প্রভূত্ব তথা 'রবুবিয়াত'-এর পরিচয় দেয়া হচ্ছে। পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত জিনিসের আকৃতি প্রকৃতি আল্লাহ দিয়েছেন যা বদলাবার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। মানুষ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির রং, প্রজনন ও স্বভাব আল্লাহর দেয়া, এতে কোনো মানুষের হাত নেই। কৃত্রিম পশু-প্রজনন, ফল-ফুল উন্নতকরণ ইত্যাদি মানুষের হাতে সৃষ্ট নয় কারণ শুক্রকীট, বীজ, মাটি ইত্যাদি সবই আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং কোনো জৈব বিষয়ে মানুষের একচ্ছত্র ক্ষমতা নেই। আর সকল জীবের স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার ও আল্লাহই দিয়েছেন।

পাখি উড়ে, হাঁস সাঁতার কাটে, মানুষ হাঁটে, এসব কেউ বদলাতে পারে না। আর, মানুষকে নবী মারফত হেদায়াত পাঠিয়াছেন তিনি সেই আল্লাহ যিনি এসব কিছুর আকৃতি প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন।

---

* 'রব বলতে প্রতিপালক প্রভূ বা আল্লাহকে বুঝায়। এটা আল্লাহর অসংখ্য গুণরাজির অন্যতম।

٤٣ : ٢٤ — اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ط يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝

٢٤:٤٤ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝ (سورة النور — پ ١٨ — ركوع ١٢)

২৪ ঃ ৪৩ — তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ মেঘগুলোকে ধীরে ধীরে চালিত করে সেগুলোকে একত্রে পুঞ্জীভূত করেন, পরে স্তরে স্তরে করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তাঁর মধ্য থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখতে পাও[৩৪]। তিনি আকাশের পাহাড়সদৃশ মেঘপুঞ্জ থেকে শিলাবৃষ্টি নাযিল করেন। এই শিলা তিনি যার উপর ইচ্ছা নিক্ষেপ করেন, আবার যাকে ইচ্ছা তা থেকে দূরে রাখেন; আর বিদ্যুৎ চমক যেন চোখকে দৃষ্টিহীন করে দেয়[৩৫]।

২৪ ঃ ৪৪— আল্লাহ্ই দিবা রাতের পরিবর্তন করেন, নিশ্চয়ই এসব বিষয়ে দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের[৩৬] জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।

(সূরা নূর, আয়াত ৪৩-৪৪, ১৮ পারা, ১২শ রুকু)

৩৪। কিভাবে ছোট ছোট মেঘের টুকরা বায়ুভরে আকাশে ভাসতে ভাসতে ক্রমে একত্রে পুঞ্জীভূত হয় এবং সে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয়, তা আজ সবারই জানা কথা, কিন্তু বিজ্ঞান যখন এটা জানতে পেরেছে, তার বহুশত বর্ষ পূর্বে ৭ম শতাব্দীর কোরআন শরীফে এ অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক ঘটনার চমৎকার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৩৫। একই রূপ মেঘ থেকে কোথাও আবার হঠাৎ শিলাবৃষ্টি হয়। এও আল্লাহর আর এক কুদরত। মেঘে মেঘে ঘর্ষণ লেগে বিদ্যুৎ চমকায় যাতে মানুষের চোখ প্রায় ঝলসে যায়। এ বৈজ্ঞানিক তথ্যও বহু পূর্বে কোরআন

মাজীদে নাযিল করা হয়েছে। আর যার উপরে এ ধরনের বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী সম্বলিত আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে, সেই মহানবী (স.) ছিলেন নিজে নিরক্ষর। সুতরাং এ আয়াতসমূহ যে তাঁর নিজের কথা নয় তা বিশ্বাস করতেই হবে; আর সে যুগে বিজ্ঞান এতো উন্নতিও করেনি, তাই একথা মানতেই হবে, কোরআন মানুষের লেখা নয়— আল্লাহ তায়ালার বাণী।

৩৬। দিবা রাতের বিবর্তনের কথা ইতিপূর্বে অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, মেঘের সৃষ্টি, এদের চলাচল, বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুত চমক, দিবা-রাতের পরিবর্তন ইত্যাদি আল্লাহর অসীম ক্ষমতারই নিদর্শন বহন করে। যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ চান তাদের উচিত এ সমস্ত অতি প্রাচীন অথচ প্রতিদিনের সাথী প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করা এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা। আর এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে পারে তারাই, যারা প্রকৃত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। তাই আল্লাহ মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী, বিদ্বান ও চিন্তাশীল তাদের নিকট যুক্তি পেশ করেছেন যেন তারা আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে। আবার এগুলো নিয়ে গবেষণা করা আল্লাহর নির্দেশ, তাই করণীয়।

٢٥ : ٥٣ ــ وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ٥

(سورة الفرقان ــ پ ١٩ ــ ركوع ٣)

২৫ ঃ ৫৩— তিনিই সে সত্তা, যিনি দু'টি স্রোতকে একত্রে মিলিত করেছেন; একটি সুস্বাদু, সুপেয়, অন্যটি লবণাক্ত ও তিক্ত। অথচ এ দু'য়ের মধ্যে এমন অলংঘনীয় বাধা রেখেছেন এরা মিশতে পারে না[৩৭]।

(সূরা ফুরকান, ১৯শ পারা, ৩য় রুকু)

৩৭। এখানে আর এক বিখ্যাত প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে। পৃথিবীতে দু'রকম পানি আছে— একটি নদী-নালা, খাল-বিল ঝরণা ও বৃষ্টি ইত্যাদির সুপেয় পানি বা মিঠা পানি (Sweet water), আর দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশব্যাপী বিস্তৃত লবণাক্ত সামুদ্রিক পানি। এ দুয়ের মধ্যে সব সময় মিলন হচ্ছে, অথচ সাগরের পানি মিঠা হচ্ছে না বা নদীর পানিও লবণাক্ত হচ্ছে না। বড় বড় নদীর পানি সাগরে মিশে যায় এবং মোহনার অনতিদূরে এ দু'পানির মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাগ দেখা যায়, যা সর্বদাই বিদ্যমান এবং তা

লোপ পায় না। ৩৫ ঃ ১২ আয়াতে একথা আবার বলা হয়েছে এবং তাতে এ দু'পানিতেই সুস্বাদু মাছ সৃষ্টি হবার কথাও বলা হয়েছে। আবার ৫৫ ঃ ১৯-২০ আয়াতে দু'প্রবাহিত স্রোতের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় বাধার কথা বলা হয়েছে। শুধু সাগর-নদী নয়, দু'নদীর স্রোতেও এরূপ স্পষ্ট বিভাগীয় রেখা দেখা যায়। ঢাকার নিকট মেঘনা ও শীতলক্ষা নদীর মধ্যে এরূপ স্পষ্ট রেখা বিদ্যমান।

২٥:٦١ـــ تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا۝ (سورة الفرقان ــ پ ١٩ ــ ركوع ٤)

২৫ ঃ ৬১— মহান সেই আল্লাহ যিনি মহাশূন্য ও সৌরজগতসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে একটি আলোক এবং আর একটি আলোকপ্রাপ্ত চাঁদ সৃষ্টি করেছেন[৩৮]। —(সূরা ফোরকান, পারা ১৯, ৪র্থ রুকু)

৩৮। মহাশূন্যে যে অসংখ্য সৌরজগত আছে, এ আয়াতে তার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, অথচ একথা বিজ্ঞান জানতে পেরেছে মাত্র কিছুদিন পূর্বে। এটাও কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রমাণ।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে সূর্য ও চন্দ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। পৃথিবী যে সৌরজগতের অংশ তার মধ্যে একটি আলোক তথা সূর্য রয়েছে, যা আমাদের পৃথিবীর সূর্য। এ সূর্যকে আল্লাহ আলোক বা প্রদীপ বলে উল্লেখ করেছেন। সূর্য নিজেই আলোর উৎস, তাই তাকে প্রদীপ বা বাতি। আর চাঁদকে আলোকিত বস্তু তথা আলোদানকারী বস্তু বলা হয়েছে। চাঁদের যে নিজের আলো নেই, এ বৈজ্ঞানিক কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে, যা বিজ্ঞান বহু পরে জানতে পেরেছে। মনে রাখা দরকার, কোরআনের পূর্বে বহু জাতি সূর্য ও চাঁদ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে এদের দেবতা ভেবে পূজা করেছে এবং আজও করছে। কোরআনই প্রথম শিখালো, এরা আমাদের খেদমতে নিযুক্ত এবং এদের একটি আলোর উৎস, অন্যটি আলোকিত বস্তু। এদের কোনো ক্ষমতা নেই। চিন্তাশীলগণ চিন্তা করুন।

٣٠:١١ـــ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝

(سورة الروم ــ پـــ ٢١ ركوع ٥)

৩০ ঃ ১১— আল্লাহই সকল সৃষ্টিরআরম্ভ করেছেন[৩৯]; তারপর তা পুনঃ সৃষ্টি করেন এবং সবশেষে সবাইকে তার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

—(সূরা রুম, পারা ২১, ৫ম রুকু)

৩৯। পৃথিবীতে যুগে যুগে কাফের মুশরিকগণ আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, অথবা কোনো কাল্পনিক দেবতা বা মানুষ বা প্রাণী অথবা বড় বড় সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ সঙ্গে শরীক করেছে। ইসলামের তাওহীদের শিক্ষার ফলে আজকাল মুশরিক দল পরাজিত হয়েছে, কিন্তু কাফের দু'টো দলে বিভক্ত হয়ে আল্লাহর বিরোধিতা করছে। একদল আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে বা পরকাল সম্বন্ধে কিছু ভাবতেই রাজি নয়। আর একদল সবকিছুই প্রাকৃতিক ঘটনা বলে দাবি করে; তারা আল্লাহর বদলে প্রকৃতি বা Nature-কেই সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করে। দুঃখের বিষয়, কোরআন শিক্ষার অভাবে এবং অনৈসলামিক শিক্ষার প্রভাবে বহু আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান নামধারী লোকও এ দলে রয়েছে। এদের প্রায় সবাই মুনাফিকের মত প্রকাশ্যে তাদের কুফরী মতবাদ প্রচার করতে সাহস পায় না; কিন্তু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাবলীর মাধ্যমে সুকৌশলে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে চলেছে। এদের ও এদের বিধর্মী (অমুসলিম) শিক্ষাগুরুদের জন্য কোরআনের এ আয়াত অতি কঠিন ও সুস্পষ্ট জবাব, যা তাদের যাবতীয় আল্লাহবিরোধী যুক্তি নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট। যারা Nature বা প্রকৃতির পূজারী অথবা Spontaneous generation (স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি)-এর দাবীদার, তাদের কাছে প্রশ্ন, যদি সব কিছু আপনা থেকেই অথবা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে থাকে, তবে প্রকৃতির প্রতিটি জড় ও জৈব বস্তুর প্রথমটির সৃষ্টি কখন, কি ভাবে ও কে করল?

পৃথিবীর মাটিতে অবস্থিত জড় পদার্থ বা মৌলিক পদার্থ (Elements) থেকে প্রথম যেদিন এমিবা (Amoeba)-র সৃষ্টি হলো (জীববিজ্ঞানীদের মতে) সেদিন কি করে জড় কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি জৈব বস্তু প্রোটিন বা বিভিন্ন জীবকোষে পরিণত হলো, কে সেই জীবকোষ সৃষ্টি করল? যত জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, জীবাণু, 'ভাইরাস' ইত্যাদি আছে, সকলেই বংশ বৃদ্ধি করছে কোনো না কোনো জৈবিক পদ্ধতিতে, কিন্তু প্রথম যেরূপ জড় বস্তু থেকে এসব সৃষ্টি হলো, আজও কেন নতুন নতুন এমিবা গোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে না।

আর যারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী তাদের কাছে প্রশ্ন, যদি একরূপ প্রাণী হতে অন্য প্রকারের প্রাণীর সৃষ্টি সম্ভব হয়ে থাকে, তবে আজ সে পরিবর্তন বন্ধ হলো কেন? বিবর্তনবাদের কোনো বাস্তব প্রমাণ কেউ দিতে পারছে না। ডারউইন নিজেও মানুষের বেলায় বিবর্তন প্রমাণ করেছেন এমন দাবি করেননি বা বানরকে

মানুষের পূর্বপুরুষ বলেননি। এক দল অতি উৎসাহী তথাকথিত বিজ্ঞানী বানরকে মানুষের পূর্বপুরুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে।

আল্লাহ্ বলেন, প্রতিটি জিনিস, জৈব ও জড় আমিই সকলের সৃষ্টি শুরু করেছি। অর্থাৎ প্রথম মানুষ, প্রথম বানর, প্রথম জীবাণু, প্রথম এমিবা, প্রথম গাছ ও ফল ইত্যাদি আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তারপর এগুলোর বংশ বৃদ্ধির জৈবিক নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে মানুষ থেকে মানুষই পয়দা হয়, বানর থেকে বানরই হয়— মানুষ বা গরু হয় না। কলেরা জীবাণু থেকে টাইফয়েডের জীবাণু হয় না। যদি বিবর্তনবাদ সত্য হতো তবে অর্ধ মানব অর্ধ বানর জাতীয় বহু সংকর জাতীয় জীবের সাক্ষাৎ মিলতো। অথচ অতি সূক্ষ্ম রোগজীবাণুগুলো পর্যন্ত তাদের আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বজায় রেখে চলে, যার উপর ভিত্তি করেই বহু রোগ নির্ণয় পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহই সবকিছু প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাদের বংশবৃদ্ধির নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। যার ফলে পুনঃ পুনঃ একই প্রকারের সৃষ্টি চলে আসছে তাদের বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং আবার সবই তাঁর কাছেই ফিরে যাবে এ বিশ্বাসই সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। ৩০ ঃ ২৭ আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে।

সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার ও চিন্তা করা উচিত, যদি একটি আলপিনও কেউ সৃষ্টি না করলে তৈরি হওয়া অসম্ভব হয়, তবে বিশ্বের কোটি কোটি মহান সুন্দর ও বিস্ময়কর সৃষ্টির কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ কি করে সম্ভব?

মানুষের বেলায় বিবর্তন সম্পূর্ণ প্রমাণিত নয়। আর বিবর্তনবাদ সত্য, প্রমাণিত হলেও সেই বিবর্তন কে করল? সে জন্যও আল্লাহকে বিশ্বাস করাই যুক্তি সম্মত।

আর যদি বানর জাতীয় জীব থেকে মানুষ হতো, তবে মানুষ থেকেও এত দিনে অন্য কোনো জীব হতো কিন্তু আজও বানর ও মানুষ নিজ নিজ জাতি (Species) হিসেবে টিকে আছে। মানুষ আদম সন্তান সবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে বানর সন্তান হবার অপমান স্বীকার করে নেবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বিবর্তনবাদ নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন।

٢٣ : ٣٠ — وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِیْنَ ٥

(سورة الروم — پ — ٢١ — ركوع ٦)

৩০ ঃ ২২— আল্লাহর অন্যতম নির্দশন হচ্ছে, তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও রঙের সৃষ্টি[৪০] করেছেন নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নির্দশনসমূহ রয়েছে।

–(সূরা রূম, ২১শ পারা, ৬ষ্ঠ রুকু)

৪০। যদিও মানুষ একই নর নারী থেকে সৃষ্ট, তবুও তাদের নানারূপ গায়ের রঙ ও বিভিন্ন ভাষা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। প্রাকৃতিক কারণে (যে প্রকৃতি আল্লাহরই সৃষ্টি) মানুষের দেহের রঙ বিভিন্ন রকমের হয়েছে। ভাষা ও রঙ বিভিন্ন এবং দেহের রঙ রকমারি করে আল্লাহ দেখিয়ে দিচ্ছেন, সকল মানুষ মূলত একই রূপ। এক ভাষার লোক অন্য ভাষার লোকের কথা বুঝে না, আবার ইউরোপীয়রা সাদা, আফ্রিকানরা ঘোর কালো, চীনারা পীত আর বাঙালিদের মধ্যে সকল প্রকার রংয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, মানুষমাত্রই আকৃতি, প্রকৃতি, শরীর গঠন ও শারীরিক কার্যপ্রণালীর (Antatomically physilogically structurally and functionally) দিক থেকে এক। এতেও জ্ঞানী লোকদের বহু গবেষণা ও চিন্তার বিষয় রয়েছে।

٢. ٣١ : ــ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَا طِنَةً ط
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا
كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ○ (سورة لقمن ــ پ ٢١ ــ ركوع ١٢)

৩১ ঃ ২০— তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর অফুরন্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করে রেখেছেন[৪১]? অথচ একদল মানুষ কোনোরূপ জ্ঞান, হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনকারী পুস্তক ব্যতিরেকেই[৪২] আল্লাহর বিষয়ে ঝগড়া করছে। (সূরা লোকমান, ২১শ পারা, ১২শ রুকু')

৪১। মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে একদা গাছ-পালা, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, চন্দ্র-সূর্য, গৃহপালিত ও বন্য প্রাণী ইত্যাদি সৃষ্ট বস্তু পূজা করতো। আজও বিশ শতাব্দীর শেষার্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ

হওয়া সত্ত্বেও সূর্য, পাথর, মূর্তি, গাভী, পর্বত, নদী ইত্যাদি নিকৃষ্ট সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে মানবতার অবমাননা করছে। ইসলাম দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি মানুষের উপকার তথা খেদমতের জন্য সৃষ্ট। এরা কেউই মানুষের পূজা প্রার্থনার অধিকারী নয়। একমাত্র ইসলামই মানুষ এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাদানকারী জীবনবিধান। আজকালকার জ্ঞান-বিজ্ঞান এতদিনে এটা অনেকটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই এভারেস্টের চূড়ায় চড়লে আজকাল আর কল্পনার মহাদেব রাগান্বিত হয় না, বটবৃক্ষ বা চন্দ্র-সূর্য মানুষের পূজা পাবার মতো কোনো গুণ রাখে না। কোরআন এ বিপ্লবী ঘোষণা দ্বারা মানব জাতিকে প্রকৃত সম্মান দিয়েছে, যা কল্পিত দেব-দেবী, অবতার, খোদার পুত্র* ও চন্দ্র সূর্য, গাভী, নদী, ইত্যাদি সৃষ্টির সামনে বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

৪২। যারা আল্লাহকে অস্বীকর করে, সেই কম্যুনিস্ট সমাজবাদী, এগনস্টিক, মানবতাবাদী, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি মতবাদের লোকেরা তাদের মতবাদ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। চরম হতাশায় এরা একটার পর একটা মতবাদ তৈরি করে চলেছে, কিন্তু কোনো বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য জবাব খুঁজে পায়নি। কোরআনে দৃঢ় বিশ্বাসই এদের চিন্তার জড়তা ও দৈন্য দূর করে মানসিক শান্তি এনে দিতে পারে।

٣٤:٣١ ــ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

(سورة لقمن ــ پ ٢١ ــ ركوج ١٣)

৩১ ঃ ৩৪— নিশ্চয়ই কিয়ামতের[৪৩] সময় কেবল আল্লাহই জানেন; তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন[৪৪] এবং মায়ের গর্ভে[৪৫] কি আছে তাও জানেন। কোনো মানুষ জানে না আগামী দিন সে কি উপার্জন করবে[৪৬] এবং কোনো জমিতে তার মৃত্যু হবে[৪৭] তাও মানুষ জানে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয় পূর্ণ জ্ঞান[৪৮] রাখেন।

—(সূরা লোকমান, ২১শ পারা, ১৩শ রুকু)

---

* অধিকাংশ খ্রিস্টানের বিশ্বাস যিশু আল্লাহর পুত্র, এমন কি তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর বা অবতার।

৪৩। সকল ধর্মই স্বীকার করে, একদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে। বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন, এক মহাপ্রলয়ের ফলে বিশ্বজগত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু কখন তা হবে স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মাঝে মাঝে খ্রিস্টান পাদ্রীরা কিয়ামতের তারিখ ঘোষণা করে। কয়েক বছর পূর্বে জনৈক ইতালীয় পাদ্রী পৃথিবী ধ্বংসের তারিখ ঘোষণা করে পাহাড়ের উপর আশ্রয় নেয়; কিন্তু তার মিথ্যা ঘোষণা তাকে লোকের কাছে হাস্যস্পদই করেছে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সকল খ্রিস্টান বিশ্বাস করত, ১০০০ খৃস্টাব্দ পূর্ণ হলে (millennium) পৃথিবী ধ্বংস হবে। ফলে বহু ধর্মভীরু খৃস্টান সংসারের যাবতীয় কাজ-কারবার ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে কেয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব এতে অনেকটা হ্রাস পায়, কিন্তু আল্লাহর নাযিল করা কিতাব পাক কোরআনে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের সময় সম্বন্ধে আর কারো জ্ঞান নেই। কোনো নবীও এ সম্বন্ধে জানতেন না, এমন কি মহানবী (স.)-কেও আল্লাহ এ সম্বন্ধে জানাননি। এ জ্ঞান মানুষের অজ্ঞাত থাকাই যুক্তিসঙ্গত, নয় তো কেউ বেপরোয়া হবে, আবার কেউ হবে হতাশাবাদী। এ দু'টির একটিও কল্যাণকর নয়।

৪৪। বৃষ্টি বর্ষণ করার মালিকও আল্লাহ। মানুষ আজকাল বৃষ্টি হবে কিনা বা কখন কোথায় হবে এ সম্বন্ধে অনেক পূর্ব ঘোষণা করতে পারে। পূর্বাভাস তারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর (বায়ুর প্রবাহ, বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা ইত্যাদি) উপর ভিত্তি করেই করে থাকে, যার উপর মানুষের কোনো প্রভাব নেই। আর পূর্বাভাস মাঝে মাঝে ভুলও হয়। আবার পূর্বাভাস নির্ভুল হলেও বৃষ্টি বর্ষণ করার মালিক একমাত্র আল্লাহ, মানুষ নয়। ছোট ছোট এলাকায় কৃত্রিম বৃষ্টিপাত সম্ভব হলেও তার দ্বারা স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের অভাব কোনো দিনই মিটবে কিনা সন্দেহ। আর যদিও বা মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ব্যাপক বৃষ্টিপাত সম্ভব হয়, তবুও তাতে স্বাভাবিক বৃষ্টির মতো কল্যাণ হবে কিনা, বলা কঠিন। পৃথিবীতে জলভাগের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখতে যে বৃষ্টির প্রয়োজন, তাতে মানুষের কোনো হাত নেই, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য।

৪৫। মাতৃগর্ভে কি সন্তান তাও আল্লাহ জানেন, অর্থাৎ তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই হচ্ছে। যদিও মাতৃগর্ভের সন্তানের লিঙ্গ সম্বন্ধে পূর্বেই জানার জন্য গবেষণা চলছে, তবুও আজও তা সর্বক্ষেত্রে জানা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তা মানুষ জানতে পারবে না এমন কথা আল্লাহ বলছেন না। আজকাল Ultrasonic sounding-এর সাহায্যে কোনো কোনো অবস্থায় শিশুর লিঙ্গ দেখা যেতে

পারে, কিন্তু যদি মানুষ এ প্রচেষ্টায় সফল হয়, তবে মানব জাতির কল্যাণ থেকে অকল্যাণই হবে বেশি। নারী পুরুষের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এমন এক ব্যাপার, যা মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কারণ জন্ম মৃত্যু মানুষের হাতে নেই। জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভের শিশুর লিঙ্গ সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার আশঙ্কা রয়েছে, কারণ তখন অনেকেই অনাগত সন্তানকে নিজের পছন্দমতো হত্যা করার চেষ্টা করবে। যেমন জাহেলী যুগের আরবরা জন্মের পর তাদের কন্যা-সন্তানকে হত্যা করত। প্রাণীজগতে এ প্রচেষ্টা মানবের জন্য কল্যাণকর হলেও মানুষের বেলায় এ প্রচেষ্টা আত্মঘাতী হবে বলেই আশঙ্কা হয়।

৪৬। মানুষ যদি তার উপার্জন সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারতো তবে সে বেপরোয়া যালেমে পরিণত হতো। তাই আল্লাহ এ জ্ঞান ও ক্ষমতা মানুষকে দেননি। বহু হিসাব-নিকাশ ও গবেষণার পরও বহুলোক ব্যবসায়ে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দিবা-রাত প্রচেষ্টার পরও বহুলোক দু'বেলার আহার জোটাতে পারে না। আবার প্রায় বিনা প্রচেষ্টায় অনেকের প্রচুর আয় হচ্ছে, এসব চিন্তা করলেই বুঝা যায়, একমাত্র আল্লাহই রিযিকের মালিক। তাই আল্লাহর অন্য নাম রায্যাক বা রুজিদাতা।

৪৭। কার কোথায় কখন মৃত্যু হবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। আর এটা না জানাই মানুষের জন্য কল্যাণকর। নতুবা মৃত্যুর সময় ও স্থান জানা থাকলে মানুষ তার দৈনন্দিন কাজ চালাতে সমর্থ হতো না। এ বিষয়ে প্রমাণ চাইলে ফাঁসির জন্য অপেক্ষারত আসামীকে দেখলেই বুঝা যাবে।

৪৮। উপরের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে; আর মানুষ এ সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হলেও এতে তাদের কল্যাণ হবে অনেক কম, কারণ পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া কল্যাণ হয় না এবং মানুষের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। মানুষ এসব বিষয়ে জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হলে ব্যক্তিগত স্বার্থে তা ব্যবহৃত হবে, যার ফল গোটা মানবজাতির জন্য অকল্যাণকর হতে বাধ্য।

٣٦ : ٣٦ ـــ سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ○

(سورة يٰسٓ ـــ پ ٢٣ ـــ ركوع ٢)

৩৬ ঃ ৩৬—— তিনিই মহান যিনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস জোড়ায় জোড়ায়[৪৯] সৃষ্টি করেছেন—— মাটির উদ্ভিদ, মানব এবং এরূপ জিনিস যার

সম্পর্কে (সাধারণ) মানুষের কোনো জ্ঞান নেই। —(সূরা ইয়াসীন, ২৩শ পারা, ২য় রুকু)

১৩ নং সূরার তৃতীয় আয়াতে ১৭ নং টীকায় এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

৪৯। মানুষ, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, লতা-গুল্ম, পোকা-মাকড় ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণীই যে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট, এ বিষয়ে আজকাল সকলেই অবহিত, যদিও মানুষ এ জ্ঞান অর্জন করেছে কোরআন নাযিলের বহুশত বর্ষ পরে। রোগ-জীবাণুর বেলায় পুরুষ স্ত্রী আজও পৃথক করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু একই জীবাণুতে পুরুষ ও স্ত্রী অংশের সন্ধান পাওয়া গেছে। রক্ত কণিকাতেও আজকাল পুরুষ ও স্ত্রী অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। এতো গেল জৈব পদার্থের ব্যাপার। জড় বস্তুর বেলায়ও জোড়া সৃষ্টি লক্ষণীয়। প্রতিটি জড় বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ এটম (পরমাণু) ধনাত্মক (Posivite) ও ঋণাত্মক (Negative) অংশদ্বয়ের সমষ্টি। গাছপালার প্রাণ আছে, তাদের বেলায় পুং-রেণু ও স্ত্রী-রেণুর মিলন প্রয়োজন। এসব কথামাত্র কিছুদিন হলো মানুষ জানতে পেরেছে। সুতরাং কোরআনের প্রতিটি কথা সত্য জ্ঞানে গবেষণা করা প্রয়োজন।

٣٦ :٣٢ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٥ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ٥ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ٥

(سورة يس ـــ پ ٢٣ ـــ ركوع ٢)

৩৬ঃ৩৮— সূর্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কক্ষপথে[৫০] ভ্রমণ করে, মহাপরাক্রমাশালী, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) কর্তৃক এটা নির্ধারিত।

৩৬ ঃ ৩৯— এবং চন্দ্রকে আমি কতগুলো অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যে পর্যন্ত না সে একটা শুকনা খেজুরের ডালের মত (বাঁকা) হয়ে ফিরে আসে[৫১]।

৩৬ ঃ ৪০— সূর্যকে অনুমতি দেয়া হয়নি যে সে চন্দ্রকে ধরবে, আর রাত দিবসকে অতিক্রম করতে সক্ষম নয়[৫২]। মহাশূন্যের সকল বস্তু নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে[৫৩]। —(সূরা ইয়াসীন, ২৩শ পারা, ২য় রুকু)

৫০। বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর সম্প্রতি সংগ্রহ করেছে যদিও তা এখনও অতি সামান্য এবং বুহ ক্ষেত্রেই প্রমাণ সাপেক্ষ। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও খ্রিস্টান ইহুদী পাদ্রীরা মনে করত, স্থির পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরে। একথা তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ঘোষণা করলেন, পৃথিবী স্থির নয় বরং সূর্য স্থির এবং পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমগ্র বিজ্ঞানজগত একথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। পরবর্তীকালে ঘোষণা করা হলো, সূর্য স্থির নয়, সেও তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরে। বিজ্ঞানের এ আবিষ্কারের প্রায় ১২০০ বছর পূর্বে পাক কোরআনে সূর্যের নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সৌরজগত সম্বন্ধে কোরআনের বহু বিবরণের মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান ও উল্লেখযোগ্য আয়াত।

৫১। চন্দ্রও যে তার কক্ষপথে ঘুরে, কোরআন তা বহু পূর্বেই ঘোষণা করেছে। চন্দ্র যে তার আকৃতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় তাও এখানে বলা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকগণ বুঝতে পেরেছেন, এর কারণ পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হওয়া। পৃথিবীতে থেকে চাঁদের আকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা একটা সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক ঘটনা, যার পরিবর্তন মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

৫২। চন্দ্র ও সূর্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুরছে, যার ফলে একে অন্যকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। অর্থাৎ এদের কক্ষপথ পৃথক। এ বৈজ্ঞানিক সত্যটুকুও আমরা জানতে পারি প্রায় ১৪শ বছর পূর্বে আরবের নিরক্ষর নবীর উপর অবতীর্ণ পাক কোরআন থেকে।

৫৩। মহাশূন্যের যাবতীয় বস্তু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, তারকারাজি ইত্যাদি নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। আজ বিজ্ঞান একথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সৌরজগত ও পৃথিবী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট, কোরআন মানুষকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার তাকিদ দিচ্ছে। প্রথম যুগের মুসলমানগণ এ পথ অনুসরণ করে বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন। পরিবর্তীকালে বিজ্ঞান শিক্ষা ত্যাগ করার ফলে আজ মুসলমান জাতি পশ্চাদপদ। আবার আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের পূর্ব গৌরব ফিরে পাব।

মানব সৃষ্টির রহস্য

২৮ : ٢ ـــ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج
ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥

(سورة البقرة ـــ پ ١ ـــ ركوع ٣)

২ঃ২৮— (হে মানুষ)! কি করে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার অথচ তোমরা ছিলে মৃত[১], অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন[২], আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন[৩], পুনরায় জীবিত করবেন এবং অবশেষে তোমরা সকলে তার নিকট ফিরে যাবে[৪]।

—(সূরা বাকারা, ১ম পারা, ৩য় রুকু)

১। সকল মানুষ জন্মের পূর্বে মৃত ছিল, একথা আজ বৈজ্ঞানিক সত্য। সন্তান মায়ের জরায়ুতে আসার পূর্বে সে ছিল পিতার শুক্রকীট ও মায়ের ডিম্বে বিভক্ত। এ শুক্রকীট (Spermatozoon) ও ডিম্ব (ovum) তৈরি হয় পিতামাতার ভক্ষিত খাদ্য থেকে। মানুষের খাদ্য আসে প্রাণী ও গাছ-পালা থেকে; আবার প্রাণীর খাদ্যও আসে গাছপালা থেকে। গাছপালা, তৃণলতা ইত্যাদি তাদের খাদ্য আহরণ করে ভিজা মাটিতে অবস্থিত মৌলিক পদার্থ (Elements) থেকে, যার সবগুলোই অজৈব বা জড় অর্থাৎ মৃত (Inorganic)। সুতরাং এ সব অজৈব পদার্থ— যেমন কার্বন, নাইট্রোজেন*, হাইড্রোজেন, লৌহ ইত্যাদি সকল প্রাণী তথা উদ্ভিদ জগতের মূল। তাই কোরআন এখানে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সকল মানুষই পূর্বে মৃত ছিল এবং আল্লাহ সেই জড় বস্তু থেকেই আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

---

* নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন যদিও গ্যাস, এগুলোও মাটিতে মিশ্রিত থাকে।

এ একই ভাব প্রকাশ পাচ্ছে সূরা দাহরের (৭৬ঃ১) প্রথম আয়াতে—

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۝

অর্থাৎ "মানুষের জীবনে কি এমন এক অবস্থা ছিল না যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুই ছিল না?"

সুতরাং আজ যেসব মানুষ শক্তি ও ধন-দৌলত অথবা পদমর্যাদার অহঙ্কারে আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারা কিছুদিন পূর্বেও পৃথিবীর মাটিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল।

২। মানব শরীরের প্রতিটি জীবকোষ জৈব জিনিসের তৈরি। শরীরের কার্বন বা লোহা, কয়লা বা লোহার মতো মৃত নয়; বরং এগুলো বৃক্ষ ও প্রাণীজগতের মাধ্যমে জৈব বস্তুতে (organic) পরিণত হয়েছে। খনির কয়লা হজম হয় না, কিন্তু শাক-সবজির কার্বন হজম হয়। কি করে যে প্রাকৃতিক জগতে জড় বস্তু জৈব পদার্থে পরিবর্তিত হয় তা আজও মানুষ জানে না। এ পরিবর্তন আল্লাহর কুদরতে হয়, সে কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষ এ বিষয় হয় তো বুঝতে সক্ষম হবে, কিন্তু এ পরিবর্তন আল্লাহর সৃষ্টির এক অতি আশ্চর্য ঘটনা এবং তা আজও রহস্যাবৃত রয়েছে।

৩। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথায় কবে"। কবির এ উক্তি কোরআনের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। আল্লাহ বলেন— অর্থাৎ "সকল মানুষকেই মরতে হবে।' সুতরাং সকল মানুষই মরবে। হযরত ঈসা (আ.)-কেও একদিন পৃথিবীতে এসে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

৪। মানুষের পুনরুত্থান কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ এ ঘটনা ঘটবে সকলের মৃত্যুর পর। পরকালের উপর বিশ্বাস ইসলাম, খ্রিস্টান, ইহুদী সকল ধর্মেরই মূল কথা। ইসলাম এতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে কঠোর নির্দেশ দেয়। এ আয়াতে বলা হচ্ছে, মৃত্যুর পর আবার সবাইকে এ জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের হিসেব দিবার জন্য আল্লাহর বিশেষ দরবারে হাজির হতে হবে। যারা এতে সন্দেহ করে তাদের এটুকু বলাই যথেষ্ট, আল্লাহ যেহেতু একবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি আবার কেন তাকে সৃষ্টি করতে পারবেন না? এ বিষয়টি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও সীমানার বাইরে। কোরআন মাজীদেও একথা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়েছে।

٥٩ : ٣ ـــ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ (سورة ال عمران پ ٣ ـــ ركوع ١)

৩ ঃ ৫৯— নিশ্চয়ই ঈসার উদাহরণ আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়, যাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন, পরে বললেন 'হও', ফলে হয়ে গেল[৫]।

৫। এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনা পিতায় জন্ম হওয়ার কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন, ঈসার কোনো দেবত্ব বা ঐশ্বরিক বিশেষত্ব নেই। সে হযরত আদম (আ.)-এর ন্যায় সৃষ্ট। আদম (আ.)-কে যেমন আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পিতা মাতার মাধ্যমে নয়, তেমনি ঈসা (আ.)ও বিনা পিতায় সৃষ্ট। মাটি থেকে সৃষ্টির ব্যাখ্যা ১ নং টীকায় দেয়া হয়েছে। হযরত ঈসার জন্মকে Parthenogenesis বলা যায়, যা ক্ষুদ্র প্রাণীর বেলায় প্রমাণিত, তবে মানুষে এর কোনো অন্য নজির নেই।

এখানে আদম (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর জন্ম সম্বন্ধে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রিস্টানরা হযরত আদম (আ.)-এর মাটি থেকে সৃষ্টির কথা বিশ্বাস করে, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনা পিতায় সৃষ্টিতে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। একইভাবে ইহুদীরা ঈসা (আ.)-কে জারজ সন্তান বলে গালি দিয়েছে। তাই আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহ হযরত আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাতে পিতা-মাতার প্রয়োজন হয়নি; তেমনি হযরত ঈসা (আ.)-কে মাতা মরিয়মের গর্ভে كن বা 'হও' বলে বিনা পিতায় সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আপত্তি বা মিথ্যা দাবীর কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই।

١:٤ ـــ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝ (سورة النساء پ ـــ ركوع ١٢)

৪ ঃ ১— হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদের একমাত্র মানব[৬] থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মানব থেকে তার জন্য সঙ্গিনী[৭]

সৃষ্টি করেছেন এবং এ দু'জনের মাধ্যমে[৮] পৃথিবীতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সেই আল্লাহকে মেনে চল যাঁর নামে তোমরা পরস্পরে অধিকার দাবী কর এবং জরায়ুর সম্পর্ককেও মেনে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেছেন।—(সূরা নিসা, ৪র্থ পারা, ১২শ রুকু)

৬। আল্লাহ মানব জাতিকে প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। একথা ৩ ঃ ৫৯ আয়াতের ৫নং টীকায়ও বলা হয়েছে। ২ ঃ ২১৩ আয়াতেও আল্লাহ একথার ইঙ্গিত করেছেন। হযরত আদম (আ.)-কে যৌন মিলন ছাড়া বিনা পিতামাতায় মাটি (تراب বা طين) থেকে সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়ে আরো আলোকপাত করা হবে।

৭। যৌন জীবনের মাধ্যম ছাড়াই আদম (আ.)-এর শরীর থেকে তাঁর সঙ্গিনী প্রথম নারী বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু তা কি করে সম্ভব হল? এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। গাছপালার ব্যাপারে যদিও একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল বা পুং-রেণু ও স্ত্রী-রেণু থাকে, মানুষের বেলায় তা হয় না। স্ত্রী না হলে শুধু পুরুষে সন্তান হয় না— এর একমাত্র ব্যতিক্রম আল্লাহর কুদরতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনা পিতায় কুমারী মাতা মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহণ। হযরত আদম (আ.)-কে যেমন কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বিবি হাওয়াকেও তাই করলেই চলতো, কিন্তু ভবিষ্যতের মানব জাতির আদি পিতা ও মাতা একই মূল উপাদানের হওয়া উচিত, নইলে হয় তো নানারূপ জৈবিক (Biological) অসুবিধা দেখা দিতে পারে। তাই আল্লাহ হযরত আদম (আ.)-এর শরীর থেকেই তার স্ত্রী ও আদি মাতা বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেন, কিন্তু এ কি করে হতে পারে, চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে, কোনো মানুষের শরীরে তার যমজ ভাই বা বোন টেরাটোমা (Teratoma) নামক এক প্রকার টিউমার হিসেবে অবস্থান করতে পারে। সেই টিউমারে একটি মানব শিশুর শরীরের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হয়ে থাকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাতে কোনো পূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম লাভ করেনি। হয় তো মানব সৃষ্টির শুরুতে একবারের জন্য তাই করা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রথম পুরুষ আদম (আ.)-এর শরীরেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনী ও যৌন-সাথী বিবি হাওয়াকেও এমনি টেরাটোমা হিসেবে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে পূর্ণ শিশু সৃষ্টির যাবতীয় উপাদান (Totipotential) বর্তমান ছিল। যখন সময় হলো তখন বিবি হাওয়াকে সেই টিউমার থেকেই বের করা হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর শরীর থেকে কিভাবে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি হলো, তার কোনো বিবরণ কোরআনে নেই। আমার এ ধারণা বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দাজমাত্র। প্রকৃত সত্য

কেবল আল্লাহই জানেন। জীববিজ্ঞানীদের (Zoologists & Physiologists) এ বিষয়ে গবেষণা করা উচিত। বিবি হাওয়ার সৃষ্টি ইতিহাসে একক ও অদ্বিতীয়।

৮। এখানে আল্লাহ বলেছেন, সেই প্রথম নর-নারীর যৌন মিলনের মাধ্যমেই আমি গোটা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি। একথাই আল্লাহ অন্যভাবে বলেছেন ৩২ ঃ ৭-৮ আয়াতদ্বয়ে—

ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ○ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ○

অর্থাৎ "তিনিই সেই আল্লাহ যিনি সমস্ত জিনিসকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টি শুরু করেছেন কাদা মাটি দিয়ে এবং তার পরবর্তী বংশধরদের সৃষ্টি করেছেন ঘৃণিত পানির নির্যাস থেকে।" সুতরাং মানুষের সৃষ্টি শুরু হয় কাদা মাটি থেকে, যা দ্বারা প্রথম নর ও নারী সৃষ্ট। তাদের জন্য পিতা-মাতা বা যৌন মিলনের প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু এর পর থেকে মানব জাতির সৃষ্টি হচ্ছে নর নারীর যৌন মিলনের মাধ্যমে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম।

যারা প্রথম মানব সৃষ্টি ও তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি অস্বীকার করেন, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, তবে প্রথম মানব-মানবী কোথা থেকে এলো? যদি ডারউইনের বিবর্তনবাদ সত্য হতো, তবে বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত নানা স্তরের জীব পৃথিবীতে পাওয়া যেত। আর সেই বিবর্তন হঠাৎ বন্ধ হলো কেন? কিংবা মানুষেরই বা আরও কোনো নতুন রূপে বিবর্তন হচ্ছে না কেন? যদি বানর জাতীয় প্রাণী মানুষের পূর্বপুরুষ হয় তবে আধা-মানব— আধা-বানর বা বিভিন্ন দৈর্ঘের লেজবিশিষ্ট মানুষ কোথায়? এ ধরনের উদ্ভট মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহকে অস্বীকার করা; নতুবা তাদের নিকট কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। বানর মানুষ হলো আর মানুষ কেন অন্য প্রাণী হচ্ছে না? অথচ আল্লাহ বলেছেন, প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া মানুষরূপেই সৃষ্ট। তার কোনো বিবর্তন আজও ঘটেনি। শুধু মানুষ কেন, সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ প্রতিটি জীবই পৃথক পৃথকভাবে করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যও জৈবিক বংশ বৃদ্ধির বিভিন্ন নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। প্রথম বটগাছ, আমগাছ, প্রথম, গরু, ভেড়া, প্রথম কলেরা জীবাণু ইত্যাদি কে সৃষ্টি করল, এর কোনো জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। সকল জীবেরই প্রথমটি আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন বললে জবাব সহজ হয়। চিরকাল বটগাছের ফলে বটের চারাই হলো; বটগাছে আম হয় না, গরুর পেটে ছাগল

জন্মায় না। বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করলে এতদিনে এ ধরনের কোনো অঘটন ঘটতো। সুতরাং একথাই পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, প্রথম নর-নারী সৃষ্টি করে তাদেরকে যৌন মিলনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করার নিয়মের অধীন করে দেয়া হয়েছে।

এবার আলোচনা করা যাক, سللة من ماء مهين বলা হলো কেন? পুরুষের বীর্য, নারীর ডিম্বানু ও তৎসংলগ্ন রক্ত, সবগুলোই নব-শিশুর জন্ম দেয় না। এ দুই নাপাক (তাই ঘৃণিত) পানির মধ্যস্থ শুক্রকীট ও ডিম্বানুর মিলনেই নব-শিশুর সৃষ্টি শুরু হয়। তাই এখানে سللة বা নির্যাস বলা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, কোরআনের শব্দবিন্যাস কত বৈজ্ঞানিক!

এখন আলোচনার বিষয়, গোটা মানব জাতির সৃষ্টি একই নর-নারী থেকে হওয়া সম্ভব কিনা। মানুষের গায়ের রং, আকৃতি, গঠন ইত্যাদির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল মানুষের শারীরিক গঠনপ্রণালী (Anatomical Structure) হুবহু এক এবং তাদের রক্তকণিকা মাত্র চার ভাগে বিভক্ত। সকল জাতির মধ্যেই এ চার প্রকার রক্তের মানুষ পাওয়া যায়। এ চার প্রকারের নাম 'A', 'B', 'AB' এবং 'O'। যদি হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়ার রক্ত কণিকা A ও B ধরা যায়, তবে তাদের বংশধরদের মধ্যে চার প্রকারের রক্তের লোক হওয়া সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত। সুতরাং কোরআনের এ বাণী— وبث منهما رجالا كثيرا ونساء সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক। তাই জঙ্গলের অসভ্য জাতি, মধ্য-আফ্রিকার নিকষ কালো নিগ্রো, চীনের পীত জাতি, ইউরোপের শ্বেতকায়, পাক-ভারতের বাদামী রং, আরব ও রেড ইন্ডিয়ানদের গায়ের রং, আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সবাই যে একই বংশের মানুষ তা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই।

কোরআন এ ঘোষণা দ্বারা সকল মানুষকে ভাই ভাই করে দিয়ে গোটা মানব জাতিকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধতে শিক্ষা দিচ্ছে। এ শিক্ষা গ্রহণ করলে ভারতের অস্পৃশ্যবাদ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার বর্ণভেদ (Segregation), ভাষা, ধর্ম ও এলাকা নিয়ে যাবতীয় ঘৃণা-দ্বেষ ও হিংসা দূর হবে এবং এতেই পৃথিবীর জন্য শান্তির মূলমন্ত্র নিহিত।

١٩:١٠ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ٥

(سورة يونس : پ ١٠ ــ ركرع ٦)

১০ ঃ ১৯— মানুষ সকলেই একজাতি[৯] ছিল, যারা পরে বিভক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু যদি আল্লাহর হুকুম পূর্বেই ঘোষিত না হত, তবে তাদেরকে তাদের (পার্থিব) বিভিন্ন অবস্থার ভিত্তিতেই বিচার করা হত।

(সূরা ইউনুস, ১১শ পারা, ৬ষ্ঠ রুকু)

৯। মানুষ যে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি, সে কথা ৪ ঃ ১ আয়াতের ৮ নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١٥:٢٦ـــ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ٥

(سورة الحجر ــ پ ١۴ ــ ركوع ٣)

১৫ ঃ ২৬— আমি পচা কাদা দিয়ে মূর্তি তৈরি করে মানুষ সৃষ্টি করেছি, যা আঘাতে[১০] শব্দ করে। (সূরা হিজর, ১৪শ পারা, ৩য় রুকু)

১০। মানুষ সৃষ্টি সম্বন্ধে কোরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে প্রথম মানুষ আদম (আ.)-এর সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে। প্রথম মানবকে যে কাদা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে সেই সৃষ্টির আরও বিবরণ দেয়া হচ্ছে। পচা কাদা মাটি দিয়ে প্রথম মূর্তি গড়া হলো এবং তা এমনভাবে শুষ্ক হলো, যাতে আঘাত করলে কুমারের মাটির পাতিলের মতো শব্দ করে। এরপর তাতে রূহ দিয়ে জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করা হলো। ১৫তম সূরার ২৯তম আয়াতে বলা হয়েছে—

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ٥

— যখন তাকে (আদমকে) রূপ দিলাম তখন তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম; তারপর (ফেরেশতাদের) হুকুম দিলাম তাকে সেজদা করতে।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, মূর্তির আকারে প্রথমে মানব সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু তার রূহ কিভাবে দেওয়া হয়েছে বা রূহ কি জিনিস তা আজও বিজ্ঞানের সীমার বাইরেই রয়ে গেছে।

١٦:۴ ــ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ٥

(سور النحل ــ پ ١٦ ــ ركوع ١٢)

১৬ ঃ ৪— আল্লাহ মানুষকে বীর্য[১১] থেকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ এ মানুষই প্রকাশ্যে আমার বিদ্রোহ করে! (সূরা নাহল, ১৪শ পারা, ১ম রুকু)

১১। এখানে نطفة বলা হয়েছে, যার প্রচলিত অর্থ বীর্য, কিন্তু আরবি আভিধানিক অর্থ জলীয় ফোঁটা। সে যাই হোক, এখানে যদি বীর্যই ধরা হয় তবুও একথা সত্য, কারণ বীর্য ছাড়া সন্তান হয় না। তা ছাড়া স্ত্রীর ডিম্বও প্রধানতঃ জলীয় পদার্থ আর শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনে উদ্ভূত জীবকোষটিও প্রায় জলীয় বস্তু। এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা পরবর্তী আরো আয়াতের সঙ্গে করা হবে।

এ আয়াতে শুক্রের উল্লেখ করা হয়েছে মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে, তার সৃষ্টি নাপাক বস্তু থেকে। রাজা, উজির, কুলি, মজুর, প্রেসিডেন্ট, গভর্নর, গরিব, ধনী, সাদা, কালো সকল মানুষই এ ঘৃণিত নাপাক বীর্য থেকেই সৃষ্ট। সুতরাং সেই মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা কুফরী করা মোটেই শোভা পায় না।

٢٠:٥٥ ـــ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○ (سورة طه ـــ پ١٦ـــ ركوع ١٢)

২০ ঃ ৫৫— মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব এবং আবার এ থেকেই তোমাদেরকে বের করব।[১২]

(সূরা ত্বা-হা, ১৬শ পারা, ১২শ রুকু)

১২। মানুষ যে মাটি থেকে সৃষ্ট তা বৈজ্ঞানিক সত্য। মৃত্যুর পর কবরস্থ করা বা শ্মশানে জ্বালানোর মাধ্যমে মানুষকে আবার মাটিতেই মিশে যেতে হবে। পণ্ডিত নেহরুর ছাই সারা ভারতের বিভিন্ন নদী নালায় ছড়িয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত সব ছাই মাটিতেই মিশে গেছে। যাদের দেহ incinerator বা চুল্লিতে পুড়িয়ে দেয়া হয়, অথবা মাছ, কুমীর বা হিংস্র প্রাণীর পেটে যায়, তারাও শেষ পর্যন্ত মাটিতেই মিশে যায়। কি সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক সত্য এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ আরো বলেন, শেষ বিচারের দিন আবার সকল মানুষ এ মাটি থেকেই বের হবে। যেহেতু আমরা মাটিতে মিশে যাব, তাই আবার বের হলে মাটি থেকেই বের হতে হবে। আর যে আল্লাহ একবার আমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করবেন, তিনি আবার মাটি থেকে সৃষ্টি করলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

٢٢:٥ ــ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا
خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ
مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا
نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا
اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط وَتَرَى الْاَرْضَ
هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ
كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ٥ (سورة الحج - پ ١٧ - ركوع ٨)

২২ ঃ ৫ — হে মানব জাতি! যদি তোমাদের মনে পুনরুত্থান সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে তবে মনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর রক্তপিণ্ড থেকে[১৩], অতঃপর মাংসখণ্ড থেকে, যার কিছুটা গঠিত ও কিছুটা অসম্পূর্ণ, যেন তোমাদের নিকট আমার শক্তি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। অতঃপর যাকে খুশি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই এবং পরে তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি। অতঃপর পূর্ণ বয়স পর্যন্ত প্রতিপালন করি ও শক্তি দান করি। তোমাদের কাউকে মৃত্যু বরণ করাই, আবার কাউকে অতি হীন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত করি, যখন তারা তাদের জানা বিষয়ও ভুলে যায়[১৪]। তোমরা আরও লক্ষ্য কর, যখন পৃথিবীকে অনুর্বর ও প্রাণহীন দেখতে পাও, তখন আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি; ফলে তা সজীব হয়, স্ফীত হয় এবং সুদৃশ্য জোড়ায় জোড়ায় অসংখ্য ফলমূলের সৃষ্টি হয়[১৫]।

(সূরা হজ্জ, ১৭শ পারা, ৮ম রুকু)

১৩। মানুষের জন্ম রহস্য সম্বন্ধে কোরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। বর্তমান আয়াতে মানব জীবনের প্রধান প্রধান স্তরগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যারা পুনরুত্থান অবিশ্বাস করে তাদেরকে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মানুষ

প্রথমে কিছুই ছিল না। সে মাটি থেকে সৃষ্ট। মাটির বিভিন্ন উপাদান থেকে পিতার শুক্রকীট ও মাতার ডিম্বানু সৃষ্টি হয়। এ দু'য়ের মিলনেই মানব শিশুর সৃষ্টি শুরু। পরবর্তীকালে যে স্তর তা হলো বৈজ্ঞানিক ভাষায় Morula, যা খালি চোখে নেহায়েত একটি রক্তপিণ্ড বলেই মনে হয়। আর তা ছাড়া জরায়ুতে সর্বপ্রথম রক্তের শিরা এবং রক্ত কণিকা সৃষ্টি হয়। তাই কোরআনেও সে কথা কত সুন্দর করে বলা হয়েছে। এ রক্তপিণ্ডে পরে মাংস দেখা দেয়, এটাও বৈজ্ঞানিক সত্য। এ সম্বন্ধে অন্য আয়াতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৪। বৃদ্ধাবস্থায় মানুষের সকল প্রকার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং যদি কেউ অতি বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাদের অনেকে সাধারণ জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেন। এক কালের অতি জ্ঞানী ব্যক্তিও নিতান্ত অসহায় জ্ঞানহীন শিশুর মতো আচরণ করে ফেলেন। সেরূপ অবস্থার কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। একই বিষয় ১৬ ঃ ৭০ আয়াতেও বলা হয়েছে।

১৫। আল্লাহ কেবল মানুষই নয়, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগৎও সৃষ্টি করেছেন। গ্রীষ্মকালে যখন পানির অভাবে মাটি ফেটে যায়, তখন বৃষ্টির পানিতে কি করে আবার পৃথিবী সবুজ হয় তা যে কোনো জ্ঞানী লোককে আল্লাহর সৃজনী শক্তির শিক্ষা দিয়ে থাকে।

١٦ـ١٢ : ٢٣ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ج
ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ٥ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا
الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ
الْخٰلِقِيْنَ ط ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ٥ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
تُبْعَثُوْنَ ٥ (سورة المؤمنون ـ پ١٨ ـ ركوع ١)

২৩ ঃ ১২— মানুষকে আমি মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি[১৬]।

২৩ ঃ ১৩— অতঃপর তা থেকে জন্মবিন্দু বা নুৎফা[১৭] সৃষ্টি করেছি এবং তা স্থিরভাবে স্থাপিত করেছি;

২৩ ঃ ১৪— অতঃপর সেই জন্মবিন্দু থেকে জমাট রক্ত[১৮], জমাট রক্ত থেকে একটি আকারহীন পিণ্ড[১৯] তৈরি করেছি; পরে সেই পিণ্ড থেকে হাড়[২০] সৃষ্টি করেছি এবং পরে সেই হাড়কে গোশত[২১] দ্বারা ঢেকে দিয়েছি; তারপর তা থেকে নতুন জীব (শিশু)[২২] সৃষ্টি করেছি, মহান সেই আল্লাহ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।

২৩ ঃ ১৫— এরপর একদিন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে[২৩]।

২৩ ঃ ১৬— এবং আবার কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে[২৪]। (সূরা মুমিনুন, ১৮শ পারা, ১ম রুকু)

১৬। মাটির নির্যাস বলার তাৎপর্য হচ্ছে, হযরত আদম (আ)-কে তো সরাসরি মাটির পুতুলের আকারে তৈরি করে তবেই তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। তার পরবর্তী বংশধর মানবকুল যদিও একই উপাদানে সৃষ্টি, তবুও তা মূর্তির আকারে তৈরি নয়। তারা পিতা মাতার যৌন মিলনের মাধ্যমে তথা শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনে সৃষ্ট। এ সৃষ্টি একদিনে নয়, বরং দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে হয়। সৃষ্টির শুরুতে যে দু'টো বস্তুর (শুক্রকীট ও ডিম্ব) প্রয়োজন, তার সকল উপাদান প্রকৃতপক্ষে মাটি থেকে এসেছে। এ বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। উপাদানগুলো মাটি থেকে বেছে নিয়েছে প্রাণী ও উদ্ভিদ, যা খাদ্য হিসেবে পিতামাতার পুষ্টি জুগিয়েছে।

১৭। নুৎফাকে সাধারণত বীর্য ধরা হয়, কিন্তু সূরা দাহারের (৭৬ ঃ ২ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (নিশ্চয়ই মানুষকে আমি সংমিশ্রিত 'নুৎফা' থেকে সৃষ্টি করেছি) দ্বিতীয় আয়াতে امشاج বা সংমিশ্রিত শব্দ থেকে বুঝা যায়, নর-নারী উভয়ের মিলিত নুৎফা থেকেই মানুষ সৃষ্ট। সুতরাং পুরুষের বীর্য ও নারীর ডিম্ববাহী জলীয় পদার্থ (ডিম-ওভারী থেকে ফেটে বের হলে তা রক্তমিশ্রিত তরল পদার্থে থাকে) দু-ই বুঝায়। এ কারণে প্রাচীন মুসলিম উলামারা স্ত্রীরও নুৎফা আছে বলেছেন। কিন্তু সেই নুৎফা পুরুষের বীর্যের মতো বাইরে আসে না; তা পেটের ভিতরেই পুরুষের শুক্রকীটের অপেক্ষা করে। এ বৈজ্ঞানিক বিষয় তাদের জানা ছিল না। কোরআন বিজ্ঞানের বই নয়, কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে বুঝাতে যেয়ে যা বলেছেন তার সবই সত্য। যা হোক, এ নুৎফা নিঃসন্দেহে পুরুষের বীর্যকেও বুঝায়। এ বীর্যে যে জিনিস সবচেয়ে প্রধান তা হলো শুক্রকীট।

এ কীট বীর্যপাতের পর মুহূর্ত থেকে ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে এবং যে পর্যন্ত এ কীট নারীর ডিম্বানুর সঙ্গে মিলিত না হয় অথবা যৌনিপথ থেকে ডিম্বানুর অবস্থান পর্যন্ত গমন পথে মৃত্যুবরণ না করে, ততক্ষণ এর যেন কোনো শান্তি নেই। তাই এরা কোরআনের ভাষায় 'বেকারার' বা অস্থির। যখন একটি কীট স্ফুটিত ডিম্বে প্রবেশ করে তখন সে শান্ত হয়। আমার ধারণা, এ আয়াতে قرار দ্বারা এ মিলনের ফলে কীটের শান্তভাবের কথাই বলা হচ্ছে।

এবার مكين বা স্থাপিত করার উপর আলোচনা প্রয়োজন। প্রত্যেক নারীর ঋতুস্রাবের পর তার জরায়ুর ভিতরের অংশ বিশেষ প্রস্তুতি চালাতে থাকে যেন তাতে পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা উর্বরাপ্রাপ্ত (Fertilized) ডিম্বানুকে ভাল করে ধরে রাখতে পারে, যেখানে তা বর্ধিত হবে। যদি স্ফুটিত ডিম্বানুকে কোনো শুক্রকীট উর্বরা না করে, তবে সেই ডিম্বানু নষ্ট হয় এবং জরায়ুর প্রস্তুতি ব্যর্থ হয় এবং সেই ব্যর্থতার রক্তিম অশ্রুই স্রাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যদি কীট ও ডিম্বের মিলন হয় তবে স্রাব হয় না। সুতরাং যখন একটি কীট ও ডিম্বের মিলন হয় তখন তা জরায়ুর বিশেষভাবে প্রস্তুত ক্ষেত্রে এসে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় (anchored)। তাই কোরআনে مكين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআন কত সুন্দরভাবে দৃষ্টি শব্দে জীব-সৃষ্টির প্রথম স্তরগুলো অতি শালীন ভাষায় প্রকাশ করল।

১৮। علقة বলতে জমাট রক্ত বুঝায়। জরায়ুর মধ্যে উর্বরাপ্রাপ্ত (Fertilized ovum) জীবকোষটি বর্ধিত হতে থাকে। এ বৃদ্ধির প্রথম স্তরে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল এর জমাট রক্তে পরিবর্তন। ভ্রূণের প্রথম কয়েকদিনের জীবনে যা দেখা যায় তা রক্ত বা রক্তপিণ্ড মাত্র। প্রথম সপ্তাহেই রক্ত সৃষ্টি শুরু হয়। علقة শব্দের অর্থ ঝুলন্ত ও বুঝায়, আর Fertilized ovum প্রকৃতপক্ষে জরায়ুতে ঝুলতে থাকে।

১৯। এ স্তরে ভ্রূণটি একটি পিণ্ডের আকার প্রাপ্ত হয়। পিণ্ড বলতে কোনো আকারহীন বস্তুকে বুঝায় এবং বাস্তবেও তাই হয়।

২০। এ পিণ্ডে এর পরে যে জিনিস সর্বপ্রথম দেখা যায় তা হলো হাড় সৃষ্টি। মাত্র ১৬ সপ্তাহে যদি এক্সরে (X-ray) ছবি তোলা হয় তবে হাড় সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তখনও গোশত ভালভাবে তৈরি হয়ে উঠে না। সুতরাং কোরআনের এ স্তরের ঘোষণা আজ বিজ্ঞান সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

২১। যদিও এখানে অতঃপর বা ثم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও এর উদ্দেশ্য এ নয়, একটি স্তর সম্পূর্ণ হলে অন্য স্তর সৃষ্টি হবে, বরং এখানে যে

কোনো স্তরের প্রথম সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে। পরবর্তী স্তরে পূর্ববর্তী স্তরের বৃদ্ধি লাভও হতে থাকে। যেমন হাড় সৃষ্টি শুরু হলেও যখন গোশত সৃষ্টি শুরু হয় তখনও হাড় তৈরি শেষ হয়নি। যা হোক, একথা বৈজ্ঞানিক সত্য, ভ্রূণের ২৪ সপ্তাহ বয়সে প্রথম হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনের (Beating of the heart) শব্দ পেটের উপর স্টেথেস্কোপ বসিয়ে শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু রক্ত চলাচল তারও আগে শুরু হয়। তাই এ হৃৎপিণ্ডের সৃষ্টি ২৪ সপ্তাহের পূর্বে ও ১৬ সপ্তাহের পরে হয়। যদি হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনই জীবনের শুরু হয়, তবে বলা যায়, কোরআনের কথামতো গোশত তার পূর্বেই তৈরি শুরু হয়। বাস্তবেও হাড় সৃষ্টির পর পর গোশত সৃষ্টিও শুরু হয়। আর হৃৎপিণ্ড নিজেও গোশত এবং যে সময় X-ray ছবিতে হাড় দেখা যায়, তখন গোশতের আভাসও দেখা যায় হাড় বেশ শক্ত না হলে X-ray ছবিতে দেখা যায় না। মোট কথা, কোরআনে বর্ণিত রক্ত-পিণ্ড, হাড় ও মাংস সৃষ্টির ক্রমবিকাশ চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারেও স্বীকৃত।

২২। এ পর্যন্ত যে জীব সৃষ্ট হলো তা কাদামাটির তৈরি আদমের মতো প্রাণহীন। এবার আল্লাহ তাতে রূহ দেন এবং তখনই সে মানব শিশুতে পরিণত হয়। মনে রাখা দরকার, সকল প্রাণীর হৃৎপিণ্ডই কুঞ্চিত হয়, কিন্তু মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীরই রূহ নেই। প্রাণ আর রূহ এক কথা নয়। রূহ কি তা মানুষ আজও জানে না আর রূহ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, এটা আল্লাহর হুকুম।

Physiology ও Embryology পুস্তকে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের সঙ্গে কোরআনের বিবরণ সম্পূর্ণ মিলে যায়। মানুষ মানব জন্মের এ রহস্য আবিষ্কার করে মাত্র ১৮৫৩ সালে, আর কোরআন নাযিল হয় এর থেকে ১২২০ বছর পূবে।* (২৩ ও ২৪) এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

٧٦ : ٢ ـــ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق نَّبْتَلِيْهِ
فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ط (سورة الدهر ـــ پ٢٩ ـــ ركوع ١)

৭৬ ঃ ২— নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সংমিশ্রিত[২৫] নুৎফা থেকে সৃষ্টি করেছি যেন আমি তাকে পরীক্ষা করতে পারি, তাই তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি। (সূরা দাহর, ২৯ পারা, ১ম রুকু)

* [এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে লেখকের বিশেষ প্রবন্ধ (History of the Discovery of the Mechanism of reproduction and revelations in the Holy Quoran, Pakistan Journal of Science, Vol. 14, No, 6. 1962) পাঠ করা যেতে পারে।]

২৫। এ আয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুরুষ ও নারীর মিলিত নুৎফা— শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনে যে মানুষ সৃষ্টি হয়, এ মৌলিক কথা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয়েছে পাক কোরআনে। এ জ্ঞান মানুষ অর্জন করেছে কোরআন নাযিলের ১২০০ বছর পর। ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও নানারূপ উদ্ভট মতবা প্রচারিত ছিল। কেউ বলত, নারীর ডিম্বে একটি ছোট মানব শিশু থাকে, তাই পরে বড় হয়। আবার যখন শুক্রকীট (Spermatozoon) আবিষ্কৃত হলে তখন একদল বলল, এ কীটই ক্ষুদ্র মানব শিশু, যা মাতৃগর্ভে পূর্ণ শিশু হয়। তারপর ১৮৫৩ সালে প্রমাণিত হয়, পুরুষের কীট আর নারীর ডিম্বের মিলনে ভ্রূণের সৃষ্টি। তারপর মাত্র ১৮৮০ সালে মানুষের ভ্রূণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। ইতিপূর্বে কেবল প্রাণীর উপরই গবেষণা চালানো হয়। সুতরাং মানব সৃষ্টির ইতিহাস আবিষ্কারের সকল কৃতিত্ব কোরআনের, অর্থাৎ কোরআন যাঁর উপর নাযিল হলো সেই শ্রেষ্ঠ মানব মহানবীর।

٨٦:٥ فَلْيَنظُرِ الْاِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ० خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ०
يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ०

(سورة الطارق ــ پ ٢٠ــ ركوع ١)

৮৬ : ৫— মানুষ কি বস্তু থেকে সৃষ্ট সে বিষয়ে সে লক্ষ্য করুক!

৮৬ : ৬— সে প্রক্ষিপ্ত[২৬] পানি থেকে সৃষ্ট—

৮৬ : ৭— যা মেরুদণ্ডের (নিম্নাংশ) ও পাঁজরের মধ্যবর্তী[২৭] অংশ থেকে বের হয়। (সূরা তারেক, ৩০শ পারা, ১ম রুকু)

২৬। এ প্রক্ষিপ্ত পানি বলতে সাধারণত পুরুষের বীর্যকেই বুঝায়; কারণ দৃশ্যত এটাই যৌন মিলনের ফলে স্ত্রীর যোনিগর্ভে বেগে স্খলিত হয়। সুতরাং এতে যে বীর্য বুঝায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এতে একথা বলা হচ্ছে না, বীর্য ছাড়া মানব শিশুর জন্মে অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না; বস্তুত বীর্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর ৭৬ : ২ আয়াতের 'মিলিত নুৎফা' দ্বারা স্ত্রীর ডিম্ববাহী তরল পদার্থও বুঝাচ্ছে। তবে এ কথা আজও মানুষের জানা নেই, ডিম্ব শুক্রকীটের তালাশে ছুটে আসে কি না। অবশ্য যখন পরিপক্ব ডিম্ব-ওভারী থেকে ফেটে বের হয়, তখন জোরেই প্রক্ষিপ্ত হয়, যেমন কোনো বেলুন ফাটলে তার

ভিতরের বাতাস জোর বের হয়। ডিম্বের জোরে বের হওয়া এ আয়াতে বুঝায় কি না তা জোরে করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তা নাও হয়, তবে এখানে শুধু বীর্য ধরলেও কোনো অসুবিধা নেই। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের আরও গবেষণার প্রয়োজন।

২৭। আয়াতের এ অংশে এ প্রক্ষিপ্ত বীর্য শিরদাঁড়ার নিম্নাংশ ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হচ্ছে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন তফসীর লেখকগণ বিভিন্ন মত অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন না। প্রকৃত অর্থ অবশ্য আল্লাহই ভাল জানেন। শরীরবিদ্যা (Antomy) থেকে জানা যায় পুরুষের বীর্য তৈরির স্থান অণ্ডকোষদ্বয় এবং নারীর ডিম্বের আধার 'ওভারী'-এ দু'টি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কোমর ও পাঁজরের মধ্যবর্তীর পেটের ভিতর অথচ পিটের শিরদাঁড়ার (মেরুদণ্ডের) সন্নিকটে সৃষ্টি হয়। শিশুর আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ দু'টি তন্ত্র (organ) ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে এবং শিশুর গর্ভকাল নয় মাসের কাছাকাছি অণ্ডকোষ পেটের বাইরে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট থলিতে চলে আসে; আর মেয়েদের বেলায় ওভারী তলপেটে জরায়ুর পাশে চলে আসে, কিন্তু এদের রক্তের শিরা ও স্নায়ুতন্ত্র (nerve) কোমর ও পাঁজরের মধ্যবর্তী প্রাথমিক স্থানেই থেকে যায় এবং সেই শিরা ও স্নায়ু এদের সঙ্গে লম্বা হয়ে দীর্ঘ হতে থাকে। বীর্য বের হওয়ার জন্য পুরুষাঙ্গের গোড়ার কাছে পেটের ভিতর যে বীর্য থলি থাকে (Seminal vesicle) তাও তলপেটেই থাকে। আর অণ্ডকোষ-বীর্য থলি বা ওভারী এসবই বেকার যদি তাদের স্নায়ুতন্ত্র সঠিক কাজ না করে। যার মূল ১০ নং কশেরুকার (Thoracic vertebra) কাছে, অর্থাৎ কোমর ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে।

সুতরাং এ আয়াতে কেবল বীর্য বুঝানো হয়েছে বলা মুশকিল; তা যদি হতো তবে কোমর ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে প্রক্ষিপ্ত পানি না বলে উরুর মধ্যবর্তী স্থান থেকে প্রক্ষিপ্ত পানি বলা হতো। মনে হয়, এতে বীর্য ও ডিম্ববাহী পানি দু'টিই বুঝায়, তাই এরূপ বলা হয়েছে।

অবশ্য এসবই আমার ধারণা যা আমি শারীর-বিদ্যা ও কোরআনের আয়াতের শব্দ-গঠনের দ্বারা বুঝেছি। প্রকৃত তাৎপর্য হয়তো অন্য কিছু, যা আল্লাহ ভবিষ্যতে মানুষকে জ্ঞাত করবেন। আশা করি এ আলোচনা চিন্তাশীল শারীর বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে গবেষণায় প্রলুব্ধ করবে। কোরআন যে সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।*

---

* এ বিষয়ে K. L. Moore রচিত The Developing Human with Islamic Additions, N. B. Saunders Co, (1983) পুস্তক দ্রষ্টব্য।

খাদ্যে হালাল ও হারাম

১৬৯ — ২:১৬৮ يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ز وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ ○

(سورة البقرة — پ ٢ — ركوع)

২ ঃ ১৬৮— হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যেসব পবিত্র ও হালাল বস্তু[১] তা থেকে তোমরা খাও, কিন্তু শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলো না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

২ ঃ ১৬৯— সে (শয়তান) তো তোমাদের পাপ ও অশ্লীল কাজের আদেশ করে থাকে এবং যেসব কথা আল্লাহ্ বলেছেন বলে তোমরা জান না সেসব কথা আল্লাহর নামে বলতে নির্দেশ দেয়[২]। (সূরা বাকারা, ২য় পারা, ৫ম রুকু)

১। যে সকল বস্তু আহার করা হালাল এবং যা পবিত্র তা খাওয়াতে আল্লাহর অনুমতি রয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। সপ্তাহের কোনো দিন বেগুন খাওয়া ক্ষতিকর এ ধরনের কুসংস্কার জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার নমুনা। হালাল বলতে জায়েজ জিনিসের কথাই বলা হয়েছে। মদ, শূকর, হিংস্র প্রাণীর মাংস, মৃত প্রাণী ইত্যাদি (এ সম্বন্ধে পরবর্তী আয়াতে দেখুন) হারাম খাদ্য ছাড়া যাবতীয় হালাল বস্তুই খেতে কোনো নিষেধ নেই। পবিত্র বলতে কেউ কেউ প্রীতিকর বা পরিতোষজনক অর্থ করেছেন, কিন্তু পবিত্র একটি ব্যাপক শব্দ। যেমন মুরগির গোশ্‌ত হালাল, কিন্তু চুরি করা মুরগির গোশত অপবিত্র। সুতরাং, হালাল ও পবিত্র এ দু'টো শব্দ দ্বারা সকল সন্দেহাতীত খাদ্যই বুঝানো হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। ২ ঃ ১৭২ আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا
لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ —

অর্থাৎ— হে মুমিনগণ, তোমরা হালাল বস্তু থেকে খাও যা আমি তোমাদেরকে আহার্য দিয়েছি এবং আল্লাহর শোকর কর, যদি তোমরা সত্যিই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর।

২। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। সে মানুষকে পাপ ও অশ্লীল কাজে প্ররোচিত করে। শয়তান বলতে অদৃশ্য জ্বীন সরদার ইবলিসকেও বুঝায়। আল্লাহর দুশমনস্বরূপ মানুষকেও বুঝায়। আজকাল সকল দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বহু আধুনিক শিক্ষিত, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নিজেরা সর্বক্ষেত্রে (কথায় কাজে) ইসলামবিরোধী, অথচ বাইরে ইসলামের নামে মিথ্যা প্রচার করছে। এরা আল্লাহ যা বলেননি তা-ই আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে। এখানে হালাল খাদ্যের কথা বলা হচ্ছে। শয়তান ও তার অনুসারীরা বহু হারাম বস্তুকেও হালাল বলে চালাবার চেষ্টা করে, যাতে পাপ ও অশ্লীলতা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'বিয়ার' (Bear) জাতীয় মদ হালাল বলার অপচেষ্টাকে ধরা যেতে পারে। এ আয়াতে অবশ্য শয়তানের প্রকৃত রূপই প্রকাশ করা হচ্ছে। এরা সুদ, মদ, জুয়া, জ্বেনা ইত্যাদি প্রকাশ্য হারামকে হালাল বলে চালাবার চেষ্টা করে যার প্রত্যেকটিই মানুষকে পাপ ও অশ্লীলতায় নিমগ্ন করে। মদ ও জুয়ার সঙ্গে অধিকাংশ অশ্লীলতার আড্ডা— পতিতালয়, নাইট ক্লাব ইত্যাদি জড়িত, একথা সর্বজনবিদিত। আমাদের দেশে সুদকে লাভ বা মুনাফা বলে জনসাধারণকে ধোকা দেয়া এরূপ অপরাধেরই নমুনা।

২:১৭৩ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا
اُحِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا
اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

(سورة البقرة — پ ٢ — ركوع)

২ ঃ ১৭৩— আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃতদেহ[৩], রক্ত[৪], শূকরের মাংস[৫] এবং যার উপর আল্লাহ ছাড়া[৬] অন্য কারো নাম ঘোষণা করা হয়েছে সেসব জিনিস হারাম করে দিয়েছেন। তবে কোনো লোক যদি বাধ্য[৭] হয়ে গ্রহণ করে অথচ সে তা বিদ্রোহী হিসেবে অথবা (শরীয়তের) সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে না করে, তবে তাতে কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

(সূরা বাকারা, ২য় পারা, ৫ম রুকু)

৩। ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে (২ঃ১৬৮ ও ১৭২) বলা হয়েছে যে, সমস্ত হালাল ও পবিত্র জিনিসই খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এখানে কয়েকটি হারাম খাদ্যের তালিকা দেয়া হয়েছে। প্রথমেই মৃতদেহ বলা হয়েছে। এতে হালাল প্রাণীরও মৃতদেহ হারাম বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ীও কোনো মৃত প্রাণীর (স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে মৃত) গোশত খাদ্য হিসেবে বর্জনীয়, যা কোরআনে অবিশ্বাসীদের অধিকাংশ মানুষেরাও মেনে চলে। কি কারণে প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায় না এবং এমনও হতে পারে, কঠিন কোনো সংক্রামক রোগ (যেমন যক্ষ্মা ও এনথ্রাক্স) অথবা কোনো বিষাক্ত জিনিসের (যেমন বিষ Toxin) প্রভাবে মৃত্যু ঘটেছে যার প্রভাব সেই মাংস গ্রহণকারী মানুষের উপরও হতে পারে। সুতরাং চৌদ্দশ বছর পূর্বের কোরআনে এ আয়াত খুবই বিজ্ঞানসম্মত।

৪। রক্ত বলতে কোরআনে শুধু প্রবাহমান রক্ত (Circulatin blood) কেই বুঝায়, যা জবেহ করার সময় দেহ থেকে বেগে বহির্গত হয় (এটা হাদীস ও কোরআন থেকে প্রমাণিত)। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই রক্তকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। শোনা যায়, কেবল স্ক্যান্ডেনেভিয়ান (নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি) দেশবাসীর রক্ত খাওয়ার রেওয়াজ আছে। জনৈক সুইডিশ আমাকে নিজে এ কথা বলেছে। প্রবাহমান রক্তে নানারূপ বিষাক্ত জিনিস (Toxin sucstances) ও রোগ-জীবাণু (Microorganisms) থাকতে পারে, যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আবার এসব দূষিত পদার্থ বের হয়ে গেলে গোশত অধিক সময় ভাল থাকে।* লক্ষ্য করার বিষয়, কতকাল পূর্বে কোরআন এ জবাইর ব্যবস্থা দিয়েছে। আল্লাহ বনী ইসরাইলদেরও জবেহ করার হুকুম দিয়েছিলেন।

---

* ইংল্যান্ডে থাকাকালে (১৯৫৬ সনে) জনৈক ইংরেজ বাইওকেমিস্ট J. Durant আমাকে বলেছেন, তাঁর কসাই পিতা একথা বলেছেন, যার জন্য তাঁর পিতা গুলিতে প্রাণী হত্যা করে সঙ্গে সঙ্গে ছুরি দিয়ে গলা কেটে রক্তপাত করেন। তার মতে মুসলিম জবেহ পদ্ধতি সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত।

৫। শূকরের মাংস বলতে শূকরের চর্বি, কলিজা ইত্যাদি সবই হারাম। এর সপক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। তিনটি সেমেটিক জাতির বা তিন প্রধান আহলে কিতাবের মধ্যে (ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমান) একমাত্র খ্রিস্টানরাই শূকর ভক্ত (কুকুর ভক্তও বটে)। তৌরিত কিতাবে শূকর হারাম, আর হযরত ঈসা (আ.) নিজে ইহুদী ছিলেন, তাই তিনিও শূকর খেতেন না। ইঞ্জিল কিতাবে শূকর হালাল করার কোনো দলিল নেই। তবুও ভ্রান্ত খ্রিস্টানরা শূকর হালাল মনে করে খাচ্ছে। শূকর হারাম হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি না, তা জানার উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুমের হেকমত বুঝার চেষ্টা করা। কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ না পাওয়া গেলেও এটা আল্লাহর হুকুম বলে মানতেই হবে। যা হোক, বর্তমানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে শূকরের মাংস হারাম হওয়ার সপক্ষে কিছু কারণ পাওয়া যায়। এছাড়া আরও কারণ থাকতে পারে যা আমরা এখনও জানি না।

(ক) শূকর মাংস থেকে ট্রিচিনিয়াসিস (Trichiniasis) নামক এক প্রকার কৃমি রোগ হয় যা অনেক সময় মৃত্যুর কারণও হতে পারে। ট্রিচিনেলা স্পাইর্যালিস (Trichinella spiralis) নামক এক প্রকার সুতার মতো কৃমির শূককীট (larva) রোগাক্রান্ত শূকরের মাংসে অবস্থান করে। ভাল করে পাক না করে (এবং 'বেকন'—Becon নামক শূকর মাংসের বিশেষ খাদ্য খুব অল্প পাক করেই খাওয়া হয়) খেলে মানুষেরও এ রোগ হয়ে থাকে। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করার পরও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ট্রিচিনিয়াসিস রোগ দেখা যায়।

(খ) শূকরের মাংসের মাধ্যমে Taenia solium (টিনিয়া সোলিয়াম) নামক অন্য এক কৃমিও বিস্তার লাভ করে। শূকর মাংস ভক্ষণের ফলে মানুষের পেটে কয়েক ফুট লম্বা এই ফিতা কৃমি হয়। এ কৃমির শূককীট (larva) শূকরের মাংসে থাকে।

(গ) শূকর মাংসের প্রভাব মানুষের চরিত্রে ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হবার আশঙ্কা নেহায়েত অমূলক নয়। একথা বৈজ্ঞানিক সত্য, মাংসভোজীরা নিরামিষভোজীদের চেয়ে বেশি শারীরিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। ভারতের মুসলিম জাতি ও শিখ সম্প্রদায় সবসময়ই নিরামিষভোজী ভারতীয় হিন্দুর তুলনায় অধিক সামরিক ও দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছে, একথা ঐতিহাসিক সত্য। মানুষ যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং যেরূপ সাহচর্যে থাকে, সেসবের প্রভাব তার চরিত্র ও ব্যবহারে প্রকাশ পেতে বাধ্য। কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ ভারতের 'ব্যাঘ্র মানব' 'রামু" প্রথম বাঘের মতো চলাফেরা করত এবং কাঁচা মাংস গ্রহণ করত। বহুদিন জঙ্গলে ব্যাঘ্রমাতার সংস্পর্শে থেকে তার

এ স্বভাব হয়েছিল। তারপর অনেকদিন সভ্য মানুষের সংস্পর্শে থেকে সে কাপড় পরা, কথা বলা ও ব্যবহারে মানুষ হয়ে উঠে। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, মানুষ যদি শূকরের মাংস খায় তবে তার মধ্যেও শূকরের চরিত্র ও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যৌন ব্যাপারে শূকর কুকুর থেকেও নির্লজ্জ ও অশ্লীল। একটি কুকুরীর জন্য কয়েকটি কুকুর মারামারি করলেও শেষ পর্যন্ত একটি কুকুরই যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হয় এবং বাকিগুলো সরে পড়ে, কিন্তু কয়েকটি পুরুষ শূকর একটি শূকরীকে বিনা যুদ্ধে পর পর ভোগ করে থাকে। শূকরভোজী খ্রিস্টান জগতে যৌন ব্যভিচার অতি ব্যাপক, যা বিভিন্নরূপে খ্রিস্টজগতে সব সময়ই ছিল। নাইট ক্লাব, বল-নৃত্য, বিবাহ-পূর্ব যৌন মিলন, নর-নারীর অবাধ যৌন মেলামেশা এবং উলঙ্গ ক্লাব ইত্যাদি আধুনিক খ্রিস্ট সভ্যতার যৌন অশ্লীলতার উজ্জ্বল ও জঘন্য নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কুকুরপ্রীতির ফলস্বরূপ যৌন ব্যাপারে নির্লজ্জতাও পাশ্চাত্য সভ্যতার আর এক রূপ। নদীর পাড়ে, পার্কে, রাস্তার পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রকাশ্যে যৌন মিলনের পূর্বরাগের মহড়া ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি খ্রিস্ট সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে অতি সাধারণ ঘটনা। গ্রীষ্মকালে সেখানকার যুবক-যুবতীরা প্রকাশ্যে যা করে তা আমাদের দেশের শরৎকালের কোনো বিশেষ নিকৃষ্ট প্রাণীর অনুরূপ। যৌন অনাচারের প্রাধান্য দেখে জনৈক সমাজ-সংস্কারক আজকের পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে শূকর ও কুকুর প্রভাবান্বিত সভ্যতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও শূকর হারাম হওয়ার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, হিংসা বিদ্বেষের বশে খ্রিস্ট সভ্যতাকে শূকর কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়নি; নেহায়েত বৈজ্ঞানিক আলোচনাসাপেক্ষে এ তুলনা করা হয়েছে; কারো মনে আঘাত দেবার জন্যে নয়। আর খ্রিস্ট সভ্যতার যৌন অশ্লীলতা অতি স্পষ্ট ব্যাপার। অবশ্য প্রতিটি পশ্চিমা নর নারীই এরূপ নয়; তাদের মধ্যেও ব্যতিক্রম হিসেবে বহু উন্নত চরিত্রের নর-নারী রয়েছে। যা হোক, শূকর হারাম হওয়ার আরও বহু কারণ থাকতে পারে যা শুধু আল্লাহই জানেন।

৬। আল্লাহর নাম ছাড়া হত্যা করা প্রাণীর গোশতও হারাম। এর মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তি নিহিত রয়েছে। যদি বিনা প্রয়োজনে বা কেবল হত্যা করার বিকৃত আনন্দলাভের জন্য হত্যার অভ্যাস করা হয়, তবে মন থেকে মায়া মমতা, স্নেহ প্রীতি ইত্যাদি কোমল মানবীয় বৃত্তিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। ডাকাত ও খুনি গুণ্ডা নিজের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নিরপরাধ লোকের প্রাণনাশ করে, কিন্তু ইসলাম এমন কোনো কাজেরই অনুমতি দেয় না যাতে হৃদয়ের উচ্চ মানবীয় বৃত্তি নষ্ট হতে পারে। প্রাণীর গোশত আমাদের জন্য খাদ্য; কিন্তু তাই বলে তাকে

অনর্থক কষ্ট দিয়ে এবং হত্যার বিকৃত আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে হত্যা করা চলবে না। সুতরাং হালাল প্রাণীও হত্যা করতে হলে আল্লাহর নাম স্মরণ করে হত্যা করতে হবে, যাতে একথা মনে থাকে, আল্লাহ এ প্রাণীকে আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন বলে এবং গোশত আমাদের শরীর পুষ্টির প্রয়োজন বলে আল্লাহরই শেখানো পদ্ধতিতে হত্যা করা হচ্ছে। কোনো জিঘাংসা বৃত্তি চিরতার্থ করার জন্য নয়। আর জবেহ করার সময় بسم الله الله اكبر বলার উদ্দেশ্য—'হে প্রাণী! আমি আল্লাহর হুকুমেই তোমার জীবন নাশ করছি, কারণ মানুষের প্রয়োজনেই তোমার সৃষ্টি। তবে একথাও আমার মনে আছে, আল্লাহ-ই সবার উচ্চে সর্বশক্তিশালী ও মহান। তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিতে সক্ষম। মুসলমানের জবেহর অভ্যাস সমাজে সকল মানুষকে এ শিক্ষাই দেয়, সকল প্রাণই পবিত্র, অনর্থক কোনো প্রাণনাশ করা হারাম। তাই মুসলমানের জীব হত্যা ঠিক হত্যা নয় বরং এ যেন প্রাণীটিকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা কোরবানী। আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে উৎসর্গ করা জীব (দেব-দেবী ইত্যাদি) হারাম, কারণ এতে আল্লাহর সঙ্গে শেরক করা হয়, যা সরাসরি কুফরী।

৭। যদি কেউ খাদ্যাভাবে মৃত্যুর আশঙ্কায় হারাম খাদ্য গ্রহণ করে, তবে সর্বজ্ঞ ও দয়ালু আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনের বেশি খাওয়া চলবে না এবং এ খাদ্যকে পছন্দ করে বা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলে হারাম হবে এবং গুনাহ মাফ হবে না। লক্ষ্য করার বিষয়, ইসলাম সম্পূর্ণ যুক্তি ও বাস্তব ধর্ম-ব্যবস্থা, এতে কোনো অচলাবস্থা নেই।

۵:۱ — اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝

(سورة المائدة — پ٦ — ركوع ١)

৫ ঃ ১— তোমাদের জন্য সকল চতুষ্পদ গৃহপালিত[৮] (তৃণভোজী) প্রাণী খাওয়া হালাল কেবল ঐগুলো ছাড়া, যেসব পরে[৯] বলা হচ্ছে, কিন্তু শিকারের প্রাণী কাবা শরীফের সীমানায় ও এহরামের[১০] অবস্থায় হারাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন সেরূপই আদেশ করেন।

— (সূরা মায়েদা, ৬ষ্ঠ পারা, ১ম রুকু)

৮। চতুষ্পদ গৃহপালিত প্রাণীকে আরবীতে انعام বলা হয়, কিন্তু তাতে হিংস্র প্রাণী বুঝায় না; বরং তৃণভোজী গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু বুঝায়। انعام বলতে উট, গরু, ভেড়া, বকরী, দুম্বা, মহিষ ইত্যাদিকে বুঝায়; বাঘ, ভল্লুক, কুকুর, শৃগাল ইত্যাদি বুঝায় না। তবে بهيمة শব্দ জুড়ে দেয়ায় অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণী হরিণ ইত্যাদিও বুঝায়। তৃণভোজী হওয়া সত্ত্বেও গাধার মাংস হারাম।

৯। হারাম প্রাণী সম্বন্ধে পরবর্তী ৫ ঃ ৪ আয়াতে বলা হয়েছে।

১০। হজ্জ ও ওমরাহর সময় এহরাম পরিহিত অবস্থায় প্রাণী-হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য হজ্জের সময় মাত্র দু'টি সেলাই ছাড়া সাদা চাদর পরতে হয়, একেই এহরাম বলে এবং এহরাম মানুষকে মৃতের কাফনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে সময় কাফন সদৃশ পোশাক পরে মানুষ গুনাহ মাফ চাচ্ছে ও পরকালের জন্য পাথেয় জোগাড় করতে ব্যস্ত, সে সময় শিকারের মতো হিংসাবৃত্তি না জায়েয হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

٣ : ٥ ـــ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ لا فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

(سورة المائدة ـــ پ ٦ ـــ ركوع ١)

৫ ঃ ৩— তোমাদের জন্য মৃত প্রাণীর[১১] গোশত, রক্ত[১২], শূকরের মাংস[১৩], আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত[১৪] প্রাণীর গোশত, শ্বাসরোধ[১৫] করে হত্যা করা প্রাণীর গোশত, কঠিন আঘাতে নিহত[১৬] প্রাণীর গোশত, উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাতপ্রাপ্ত[১৭] প্রাণীর গোশত, শিং-এর আঘাতে আঘাতে (পশুর লড়াইসহ) নিহত[১৮] প্রাণীর গোশত, যে প্রাণীর কিছু অংশ হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে, অবশ্য যদি তাকে জবেহ করার সুযোগ পাওয়া যায়[১৯], যা কোনো বেদীর উপর বলি[২০] দেয়া হয়েছে এবং যে গোশত তীর ছুড়ে ভাগ[২১] করা হয়েছে— এসবই হারাম। এসবই ফাসেকের কাজ।

আজকের দিনে কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছে ; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর।

আজকের দিনে আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম ও আমার নেয়ামত তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে মনোনীত (নির্দিষ্ট) করে দিলাম।

যদি কেউ ক্ষুধার[২২] তাড়নায়— পাপ করার উদ্দেশ্যে নয়— হারাম গোশত খেতে বাধ্য হয়, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(সূরা মায়েদা, ৬ষ্ঠ পারা, ১ম রুকু)

১১। এ সম্বন্ধে ২ ঃ ১৭৩ আয়াতের ৩ নং টীকা দেখুন।
১২। " " " " " ৪ নং " "
১৩। " " " " " ৫ নং " "
১৪। " " " " " ৬ নং " "

১৫। এ আয়াতে মোট ১১টি হারাম খাদ্যের কথা বলা হয়েছে, যার প্রথম ৪টি ১৭২ নং আয়াতের ৩, ৪, ৫ এবং ৬ নং টীকায় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাকি ৭টির কথা বলা হচ্ছে।

শ্বাসরোধ করা হিংস্রতার নমুনা এবং ইসলাম কোনোরূপ হিংস্রতা অনুমোদন করে না। শ্বাসরোধ করে হত্যা করলে প্রাণীকে অনর্থক অধিক কষ্ট দেয়া হয়। এর ফলে মৃত প্রাণীর শরীরে অত্যধিক দূষিত রক্ত ও গ্যাস (Excess Co_2due to asphyxia) জমা হয়, যা খাদ্য হিসেবে গোশতের মান কমিয়ে দেয়। এরূপ দূষিত রক্ত শরীরে আটকে থাকায় গোশতে সেই দূষিত বস্তুগুলো মিশ্রিত হয়। প্রবাহিত রক্ত বের করে দেয়ার উপকারিতা ২ : ১৭৩ আয়াতের ৪ নং টীকায় বলা হয়েছে।

১৬। কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর গোশতে অতিরিক্ত ল্যাকটিক এসিড (Lactic acid) জমা হয়, যা গোশতকে অতিরিক্ত আড়ষ্ট করে তার মান

কমিয়ে দেয়। তাছাড়া এটাও বর্বরতা ও হিংস্রতার নমুনা। হিন্দুদের বলি ও পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত মানবীয় কায়দায় (humane method) বুলেটে নিহত করা বা মেশিনে কাটা কঠিন আঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণীকে বলি দেয়া হয় ঘাড়ের দিক থেকে কঠিন আঘাত দিয়ে। এতে মেরুদণ্ডের হাড় বিনা প্রয়োজনে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। আর মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ স্পাইনাল কর্ড (Spinal Cord) হঠাৎ কাটার ফলে শরীরের যাবতীয় গোশত আঁকড়ে যায় (Contracted) এবং অনেক প্রয়োজনীয় রস তা থেকে বের হয়ে যায়। এর তুলনায় জবেহ্ অনেক কম আঘাতে হয় এবং তাতে গোশত নষ্ট হয় না। ইসলামী পদ্ধতির জবাইতে খুব অল্প সময়ে প্রচুর রক্তপাতের ফলে প্রাণী সংজ্ঞা হারায়, তাই কোনো ব্যথা পায় না। জবাইর সময় যে কুঞ্চন হয় তা মস্তিষ্কে রক্ত কম বলে, ব্যথায় নয়।

১৭। কোনো উচ্চস্থান থেকে নীচে পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত প্রাণীর গোশতেও ল্যাকটিক এসিড বেশি থাকবে এবং এর ফলে গোশত আঁকড়ে যাবে! ফলে গোশতের মান কমে যায়।

১৮। প্রাণীতে প্রাণীতে লড়াই লাগিয়ে দেয়ার অসভ্য প্রথা এখানে হারাম করা হচ্ছে। এ লড়াইয়ে একটির আঘাতে অন্যটি বা দু'টিই মরে গেলে তাদের গোশতও হারাম। এ ধরনের পশুর লড়াইও কতটুকু বর্বর রুচির পরিচায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ ধরনের মনোবৃত্তি পাশবিক ও হিংস্র। স্পেন প্রভৃতি দেশে Bull Fight (বুল ফাইট) নামক এক প্রকার বর্বর খেলা চালু আছে। এতে ষাঁড়কে বার বার আঘাত করে হত্যা করা হয় এবং তা বীরত্বের পরিচায়ক! এসব হিংস্রতা আজও তথাকথিত 'অহিংস' খ্রিস্টান সমাজে বর্তমান। ইসলাম এসব হারাম করে দিয়ে মানবতার পরিচয় দিয়েছে।

১৯। হিংস্র প্রাণী কোনো হালাল প্রাণীর অংশবিশেষ খেয়ে ফেললে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে জবেহ্ করলে খাওয়া হালাল, নয়তো হারাম। হিংস্র প্রাণীর কামড়ে নিহত প্রাণীর শরীরে কোনো বিষাক্ত জিনিস প্রবেশ করতে পারে। যদি জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে হিংস্র প্রাণীর আঘাত খুব অল্প সময় পূর্বে ঘটেছে বা আঘাত অতি সামান্য— এমতাবস্থায় গোশত দূষিত হবার সম্ভাবনা কম। হিংস্র প্রাণীর কামড়ে যদি কোনো হালাল প্রাণী অচল হয় ও খুব কষ্ট পায়, তখন তাকে জবেহ্ করে কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের খেদমতে লাগানো অনেক ভাল সন্দেহ নেই। বিকলাঙ্গ প্রাণীর শেষ পরিণতি অপমৃত্যু।

২০। কোনো বেদীর উপর হত্যা করার মানে কোনো দেব-দেবীর নামে বলি দেয়াও বুঝায় এবং তা শিরক।

২১। তীর মেরে গোশত ভাগ করা লটারি এবং এ ধরনের লটারির উদ্দেশ্য হলো লোক ঠকানো, যা জুয়ার পর্যায়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে ২ : ২১৯ আয়াতে জুয়ার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে।

২২। যেসব জিনিস হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা সকল মুসলমানকে মানতেই হবে, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থায় পতিত হয়, যখন হারাম গোশত না খেলে তার মৃত্যুর আশংকা আছে এবং যদি তখন সে কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু মাত্র গ্রহণ করে, তাও উদর পুরে নয় এবং আল্লাহ্ হুকুম অমান্য করার উদ্দেশ্যে নয়— তবে দয়ালু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৫:৪ ـــ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ
اللّٰهُ ز فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ص
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ٥

(سورة المائدة ـــ ب ٦ ـــ ركوع ١)

৫ ঃ ৪— (হে মুহাম্মদ,) তোমাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, কোনো কোনো খাদ্য তাদের জন্য হালাল। বল, তোমাদের জন্য সকল পবিত্র জিনিসই[২৩] হালাল এবং যদি তোমরা তোমাদের শিকারী প্রাণীকে আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে শিকার ধরা শিক্ষা দাও, তবে তারা যেসব প্রাণী তোমাদের জন্য ধরে আনে তা খাও, তবে তার উপর আল্লাহর নাম[২৪] উচ্চারণ করে নিও। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হিসাব নিতে খুব দক্ষ (খুব তাড়াতাড়ি নেবেন)।

(সূরা মায়েদা, ৬ষ্ঠ পারা, ১ম রুকু)

২৩। পবিত্র বস্তু যে হালাল সে সম্বন্ধে ২ ঃ ১৬৮ আয়াতের ১ নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৪। সাধারণত কুকুরকে শিকারী প্রাণী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কুকুর হিংস্র বিধায় হারাম, এমনকি তার কামড়ে নিহত প্রাণীও হারাম, যদি না

জীবিত অবস্থায় তা জবেহ্ করা সম্ভব হয়। ৫ ঃ ৩ আয়াতের ১৯ নং টীকায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ বলেছেন, শিকারী কুকুরকে এমন ট্রেনিং দাও যেন ওরা কামড় দিয়ে পাখি বা হালাল প্রাণী হত্যা না করে, বরং শুধু পালকে কামড় দিয়ে বা সাবধানে ধরে কেবল প্রভুর নিকট নিয়ে আসে। অবশ্য শিকারী প্রাণী কর্তৃক ধৃত প্রাণীও জীবিতাবস্থায় আল্লাহর নামে জবেহ্ করে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, অনেক সময় শিকারী বাজ পাখি দিয়েও হালাল পাখি শিকার করা হয়। সেখানেও একই শর্ত প্রযোজ্য।

٥ :٥ — اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا
مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز
وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

(سورة المائدة — پ ٦ — ركوع ١)

৫ ঃ ৫— আজ তোমাদের জন্য সকল পবিত্র জিনিস হালাল করা হলো। পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের[২৫] খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য সাধ্বী মুমিনা স্ত্রীলোক হালাল এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের সাধ্বী নারীও হালাল, তবে তাদেরকে উপযুক্ত মোহরানা দিতে হবে এবং সতীত্বই উদ্দেশ্য হতে হবে, যৌন ব্যভিচার নয় অথবা গোপন অভিসারও নয়[২৬]। যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার সকল কর্ম ব্যর্থ হবে এবং আখেরাতের দিন সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ০

(সূরা মায়েদা, ৬ষ্ঠ পারা, ১ম রুকু)

২৫। আহলে কিতাবদের খাদ্য মুসলমানদের জন্য হালাল। পূর্ববর্তী ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ আহলে কিতাব সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য কোনো জাতি আহলে

কিতাব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে এবং প্রমাণও নেই। এমতাবস্থায় ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মতঃ তৈরি খাদ্য যদিও আমাদের জন্য হালাল, তবে তাদের তৈরি মদ বা শূকর-মাংস বা হারামভাবে নিহত প্রাণীর গোশত কিন্তু হারাম, কারণ এগুলো স্পষ্টভাবে কোরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন জাগে— ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার খ্রিস্টানদের নিহত গরু ভেড়ার গোশত মুসলমানদের জন্য হালাল কিনা। খ্রিস্টানদের আল্লাহর নামে জবেহ্ কোরআনের আয়াত অনুসারে হালাল, কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি, তারা মুরগিকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। সুতরাং এটা ৫ ঃ ৩ আয়াত অনুসারে হারাম। সুতরাং আজকালকার খ্রিস্টানদের হাতে নিহত কোনো পাখির গোশত খাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। গরু ভেড়া এরা বুলেটে হত্যা করে। সুতরাং সেখানেও কঠিন আঘাতে মৃত্যু ঘটানো হয় বলে ধরা যায় (৫ ঃ ৩)। তাই অধিকাংশ আলেমের মতে আজকালকার খ্রিস্টানদের দ্বারা নিহত প্রাণীর গোশত মোটেই হালাল হবে না। যদি তারা আল্লাহর নামে জবেহ্ করে তবে নিশ্চয়ই হালাল হবে। সুতরাং বিদেশে গেলে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। অবশ্য জীবন্ত মুরগি কিনে নিজেরা জবেহ্ করে নিলেই চলবে। ইহুদীদের জবেহ্ করা গোশত হালাল। কারণ তারা 'জেহোভা'র নামে জবেহ করে থাকে। এ ধরনের গোশতকে 'কশার' গোশত (Kosher meat) বলা হয়। তারা রাব্বি (ইহুদী-আলেম) দ্বারা জবেহ্ করে। সুতরাং ইউরোপ ও আমেরিকায় কশার দোকান তালাশ করে গোশত কিনতে হবে। আজকাল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনে অনেক পাক-ভারত-বাংলাদেশি মুসলমান হালাল গোশতের দোকান খুলে সমস্যার অনেকটা সমাধান করেছেন। এ গোশত জোগাড় করে নিজে পাক করা সম্ভব না হলে হোটেল রেস্তরাঁয় মাছ ডিম খাওয়াই সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সওয়াবের কাজ।

হিন্দুরা মুশরিক, তারা কঠিন আঘাতে পশু বলি দেয়, বিশেষ করে বিভিন্ন দেবতার নামে। সুতরাং তাদের তৈরি গোশতের খাদ্য হারাম। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর মানে না সুতরাং তাদের তৈরি গোশতও হারাম। রাশিয়া ও চীনে যদি মুসলমান বা ইহুদীদের দ্বারা আল্লাহর নামে জবেহ করা গোশত পাওয়া যায় তবে হালাল, নয়তো হারাম হবে, কারণ কম্যুনিস্টরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে, অর্থাৎ কাফের। জাপানিদের বেলায়ও তাই।

২৬। এ বিষয়টা যৌন বিষয়ের সঙ্গে আলোচিত হবে (কোরআনের দৃষ্টিতে যৌন-জীবন— টীকা-২১)।

٨٨ ــ ٨٧ : ٥ ــ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا
اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ٥
وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ
مُؤْمِنُوْنَ٥ (سورة المائدة ــ پ ٧ ــ ركوع ١٢)

৫ ঃ ৮৭— হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! যে সমস্ত পবিত্র বস্তু আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তা হারাম[২৭] করো না এবং সীমা অতিক্রম[২৮] করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।

৫ ঃ ৮৮ — এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সমস্ত জিনিস হালাল ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন সেগুলো ভক্ষণ করো, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করো, যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো। (সূরা মায়েদা, ৭ম পারা, ১২শ রুকু)

২৭। আল্লাহ যা হালাল বলে ঘোষণা করেছেন তা হারাম মনে করা কঠিন গুনাহ। হিন্দুরা গরু এবং ইহুদীরা উট ও চর্বি হারাম মনে করে। এসবই তাদের মনগড়া। এখানে আমাদের মুফতিদের জন্য একটি ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ ৫ ঃ ৫ আয়াতে আহলে কিতাব বলে খ্রিস্টানদের তৈরি হালাল খাদ্য জায়েয করেছেন, কিন্তু তাদের তৈরি গোশত আমরা হারাম মনে করি, কারণ তারা বুলেটে হত্যা করে। অবশ্য এখানে ৫ ঃ ৩ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।

২৮। কোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন করা হারাম। যা হুকুম তাই মানতে হবে; এতে মনগড়া শর্ত যোগ দিয়ে জটিল করা বাড়াবাড়ি। ইহুদী ও হিন্দুদের মতো খাদ্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি খুবই অন্যায়। আবার খ্রিস্টানদের মতো সর্বভুক হওয়াও আর এক প্রকারের অতি বাড়াবাড়ি। ইসলাম যুক্তি ও বাস্তব ধর্ম। এতে বাড়াবাড়ির মোটেই স্থান নেই।

মদ ও জুয়া

২২০ ـ ٢١٩ : ٢ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ
فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط
وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ٥ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط

(سورة البقرة ـ پ ٢ ـ ركوع ٢٧)

২ ঃ ২১৯-২২০— (হে রাসূল!) মানুষ আপনাকে মাদকদ্রব্য ও জুয়াখেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, এ দু'টোর মধ্যেই কবীরা গুনাহ রয়েছে এবং মানুষের কতক উপকারও রয়েছে; কিন্তু এদের অপকার এদের উপকার থেকে অনেক বেশি[১]। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (দান খয়রাতে) কতদূর খরচ করবে? আপনি বলুন, যতদূর সহজসাধ্য হয়। এরূপেই আল্লাহ তাঁর হুকুম আহকাম (নির্দেশসমূহ) তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মে গভীর চিন্তা কর।

(সূরা বাকারা, ২য় পারা, ২৭শ রুকু)

১. মদ জুয়া দু'টোতেই মানুষের জন্য বহু অকল্যাণ রয়েছে। যত কাজকে হারাম করা হয়েছে তার সবই মানুষের জন্য অকল্যাণকর; তাই اثم-কে গুনাহ বা অপকার দুই-ই ধরা যায়। আর যা পুণ্যের কাজ তা প্রকৃতই মানুষের জন্য কল্যাণকর। সুতরাং মদ-জুয়া এ দু'টোতেই মানুষের অনেক ক্ষতি হয়, সে কথাই এ আয়াতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ সত্য ছাড়া

বলেন না, তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিচ্ছেন, এতে মানুষের কতক উপকারও রয়েছে। মদের সামান্য খাদ্য মূল্য (food value) এবং নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও নিষ্কাশন (Extraction)-এর ব্যবহার রয়েছে। তবে মদের যত উপকার তা খাদ্য হিসেবে নয়, খাদ্য হিসেবে এর মূল্য নগণ্য। মদ্য-পানের আসক্তি অতি সহজেই হয়ে যায় এবং মদ্যপানের ক্ষুধা নষ্ট হয়, ফলে সে অল্প আহারে বাধ্য হয়। আবার মদের উপর অতিরিক্ত খরচ করায় দারিদ্রের ফলেও তাকে স্বল্প আহারে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এর মারাত্মক ফল হিসেবে প্রায়ই প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ ও এমাইনো এসিড কম গ্রহণ করা হয়, যার পরিণতি চর্বিযুক্ত যকৃৎ (Fatty Liver) ও সিরোসিস' (Cirrhosis) নামক যকৃতের কঠিন ব্যাধি। মদের ব্যবহারিক উপকার আছে, কিন্তু পানীয় হিসেবে নয়। অনুরূপভাবে জুয়ার ফলেও কিছু লোক যথেষ্ট উপকার পেতে পারে; যেমন Get-a Word, Prize Bond, লটারি, রেসখেলা ইত্যাদি যাবতীয় জুয়ার মারফত মানুষ মাত্র দু'-শ টাকার বিনিময়ে হাজার হাজার টাকা পেতে পারে কিন্তু এর ফলে অসংখ্য লোক তাদের আসল বা লাভের অংশ হারায়। অথচ অনেক লোক জুয়ায় দাঁও মারার লোভে বছরের পর বছর টাকা লাগিয়েই যায় এবং অভাবে পতিত হয়ে সপরিবারে দারিদ্রের শিকারে পরিণত হয়। যারা জুয়ার টাকা পায় তারা বিনা কষ্টে লব্ধ টাকায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশ্লীলতায় নিমগ্ন হয়। যাদের জুয়া খেলার টাকা নেই বা জুয়ায় টাকা হারিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়, তারা চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহের চেষ্টা করে, ফলে সমাজে নানা অপরাধ বৃদ্ধি পায়। মদ ও জুয়া দু'টোই নেশা।

মদ ও জুয়ার নেশায় বহু স্বল্প আয়ের লোক ও কিছু ধনী ব্যক্তি নিজের পরিবারের ও বংশধরদের সর্বনাশ করে থাকে। এর মারফত কেবল কিছু সংখ্যক জুয়াড়ি, মদের ক্লাব-পরিচালক ও রেসকোর্সের মালিকেরাই সাময়িক লাভবান হয়।

মদ যে পানীয় হিসেবে শরীরের কেবল ক্ষতিই করে, এ বিষয়ে সকল বৈজ্ঞানিকই একমত। বিখ্যাত বাইওক্যামিস্ট, ফার্মাকোলজিস্ট ও চিকিৎসক গবেষণা করে দেখিয়েছেন, মদ মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। মদ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়, আর তখন সে এমন সব নির্লজ্জ কাজ করে যার জন্য নেশামুক্ত হয়ে তাকে খুবই লজ্জিত অনুতপ্ত হতে হয়। আমেরিকার বিখ্যাত ফার্মাকোলজিস্ট ডাঃ হার্জার* মটর দুর্ঘটনার সঙ্গে মদ্য-পানের সম্পর্ক দেখিয়ে তার গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ

* Harger, R. N (1948), The Pharmacology and Toxicology of Alcohol, J. Am. Med. Assoc, 167, 2201.

প্রকাশ করেছেন।* মদ ও জুয়া সমাজের বেশির ভাগ অপরাধ, মোটর দুর্ঘটনা ও খুন খারাবির জন্য দায়ী। মদ্যপান সমাজের জন্য এক বিরাট সমস্যা ও আপদ। মদের দেশ ইউরোপ আমেরিকায়ও আজকাল এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হচ্ছে। সম্প্রতি লন্ডনের কেনসিংটনস্থ সেন্ট লিউকস্ হাউসে এলকোহলিজম ইন্‌ফরমেশন সেন্টার (মদ্যপানের তথ্য কেন্দ্র)-এর উদ্বোধন উপলক্ষে লর্ড ব্রেইন বলেন— Chronic alcoholics are more than a mere medical problem. Their dependence on alcohol had social consequences just as wide spread as drug taking.— অর্থাৎ মদের নেশাগ্রস্ত বা মদ্যপরা সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ের সমস্যারও অত্যধিক। মদের উপর তাদের নির্ভরতা নেশার ওষুধের মতোই সমাজের উপর বহুল কুপ্রভাব বিস্তার করে। [পাকিস্তান অবজারভার, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৬৫ (২)]।

মদের মারাত্মক অনিষ্ট সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর এ হাদীসই যথেষ্ট। রোগের ওষুধ হিসেবে মদের ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে মহানবী (স.) বলেন— (مسلم) انه ليس يدواء ولكنه داء —ওষুধ হওয়া তো দূরের কথা, নিজেই একটি ব্যাধি। (মুসলিম শরীফ)

আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানও ঠিক একথাই বলছে।

৪৩: ৪ — يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا٥

(سورة النساء — پ — ركوع ٧)

---

* ডা. হার্জ্যুর কিছুদিন আগে করাচির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউটে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন এবং একবার এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বক্তৃতা করেছিলেন, যেখানে লেখক নিজেও উপস্থিত ছিলেন।

৪ ঃ ৪৩— হে মুমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়োনা যে পর্যন্ত না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে বা জানতে[২] পারো; আর নাপাক অবস্থায়ও— যদি মুসাফির না হও— নামাযের নিকটবর্তী হয়োনা, যে পর্যন্ত না তোমরা গোসল[৩] করবে; কিন্তু যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা ভ্রমণকালে অথবা যদি কেউ মলত্যাগ করে থাকে বা তোমরা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এসে থাকো, অথচ পানি না পাও, তবে পাক মাটি বা ধূলি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ[৪] করে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা, ৫ম পারা, ৭ম রুকু)

২. এখানে মদ, গাঁজা ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু দ্বারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা ক্রমে ক্রমে মদ হারাম করার দ্বিতীয় পর্যায়। আর ২ ঃ ২১৯ আয়াত ছিল প্রথম পর্যায়। মদ্যপানের মতো কঠিন কু-অভ্যাস অল্প সময়ে দূর করা সম্ভব নয়। তাই ২ ঃ ২১৯ আয়াতে প্রথম ঘোষণা করা হলো, মদ ও জুয়ার অপকারিতা উপকার থেকে অনেক বেশি; সুতরাং পরিত্যাজ্য। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্তও মদপান সরাসরি হারাম ঘোষিত হয়নি, কিন্তু নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করায় মদ্যপানের পরিমাণ কমানো হলো। নামায ফরজ এবং দিনে পাঁচবার; সুতরাং ফজরের পর ও এশার পর ছাড়া আর মদ্যপানের সময় থাকলো না। হুশিয়ার মুসলমানগণ এ সময়ই মদ্যপান ত্যাগ করে, আর অনেকে পরিমাণ কমিয়ে দেয়। মনে রাখা দরকার, মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হয়ে নামায ত্যাগ করার অজুহাত সৃষ্টি করলে নামাজ মাফ হবে না বরং কঠিন গুনাহ হবে।

৩. স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করা এ আয়াত দ্বারা ফরজ করা হয়েছে। সহবাসের পর গোসল না করে নামায পড়া নিষেধ। যৌন মিলনে যথেষ্ট শারীরিক, মানসিক ও স্নায়ুবিক পরিশ্রম হয় এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গোসল করাই এর প্রভাবমুক্ত হওয়ার একমাত্র সুষ্ঠু উপায়।

৪. এ আয়াতের ফলেই তায়াম্মুম করা জায়েয হয়। ইসলাম যে যুক্তিপূর্ণ বাস্তবধর্মী ও সহজ পালনীয় জীবনপদ্ধতি বা দ্বীন, তার অন্যতম প্রমাণ এ তায়াম্মুমের ব্যবস্থা। যে যে কারণে গোসল ফরজ সেসব অবস্থা থেকে মানুষ অনেক সময় দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে না, যদিও গোসলের অসুবিধা বর্তমান থাকে। সুতরাং রুগ্ন অবস্থায় স্বপ্নদোষ হতে পারে, ভ্রমণে মলত্যাগের প্রয়োজন হতে পারে, ভ্রমণে বা পানিহীন স্থানেও স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা হতে পারে; তাই এসব অবস্থায় বিধি-নিষেধের অবাস্তব গণ্ডি টেনে দিয়ে আল্লাহ মুমিনদের

অসুবিধা না করে পানির অভাবে তায়াম্মুম করার সহজ বিধান দিয়েছেন। তায়াম্মুমে শরীরের নাপাক সত্যি সত্যি দূর হবে না; কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালন ও নিয়মানুবর্তিতা পালন করা হবে। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ স্বীয় ক্ষমাগুণে মানুষের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মাফ করে দেবেন এবং নাপাক দূর না হওয়া সত্ত্বেও নামায কবুল করা হবে। কোনো ব্যাপারেই অচলাবস্থা সৃষ্টি করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়; বরং সকল সমস্যা ও অচলাবস্থার সমাধান পেশ করাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। একই বিষয় ৫ ঃ ৭ আয়াতেও সুন্দর করে বলা হয়েছে।

٩١ــ٩٠: ــ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○ (سورة المائدة ــ پ ٧ ــ ركوع ١٢)

৫ ঃ ৯০— হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, স্থাপিত পাথর (মূর্তি) সমূহে বলি দেয়া ও তীর দ্বারা গোশত ভাগ করা শয়তানের কাজ; সুতরাং এগুলো থেকে বিরত[৫] থাক যদি তোমরা সাফল্য লাভ করতে চাও।

৫ঃ৯১— নিশ্চয়ই শয়তান মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসার সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়; তবুও কি তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকবে না[৬]?

(সূরা মায়েদা, ৭ম পারা, ১২শ রুকু)

৫. মদ ও জুয়া সম্বন্ধে এটাই তৃতীয় আয়াত, যা মদ হারাম করার তৃতীয় বা শেষ পর্যায়। সমাজ সংস্কারে 'ধীরে চলো' নীতি অপরিহার্য; তাই এমনি করে তিন পর্যায়ে আল্লাহ মদ্যপান হারাম করেন। এ আয়াতে এক সঙ্গে মদ ও জুয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মদ বন্ধ করার খোদায়ী নীতির ফল এ দাঁড়িয়েছিল,

এ আয়াত নাযিল হবার ও প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে মদীনার সকল মুসলমান তাদের সমস্ত সঞ্চিত মদ রাস্তায় ঢেলে দেয়, যার ফলে মদীনার রাস্তায় মদের স্রোত বয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের পান-গ্লাসগুলোও ভেঙ্গে ফেলেন। আজও মাতাল ও অন্যান্য নেশাখোরদের চিকিৎসার বেলায় এ 'ধীরে চলো' নীতিই অনুসরণ করা হয়। জুয়াও মদের সঙ্গে হারাম করা হয়। জুয়ার জন্য তিন পর্যায়ের প্রয়োজন হয়নি, বরং দ্বিতীয় পর্যায়েই তা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২ : ২১৯ আয়াতে প্রথমে এর নিন্দা করা হয়। জুয়ার নেশা দূর করতে মদের নেশা দূর করা থেকে কম সময় লাগাই স্বাভাবিক। আল্লাহ কোরআনে মানুষকে সমাজ সংস্কারের সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা দেখিয়ে দিচ্ছেন।

বলি দেয়া শেরক তাই হারাম। আর তীর মেরে গোশত ভাগ করা লটারি এবং এটাও এক প্রকার জুয়া।

৬. মদ ও জুয়া হারাম করার প্রধান কারণ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা এখানে দু'টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

(ক) মদ ও জুয়া মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর মদ ও জুয়া প্রায়ই একত্রে চলে, তাই আল্লাহও একত্রেই তাদের আলোচনা করেছেন। যেখানে মদের আমদানি হয় সেখানে জুয়ার আড্ডা বসবেই; আবার জুয়ার আড্ডায় অতি সহজেই মদের আবির্ভাব হয়।

মদ ও জুয়া যে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ তথা নানারূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাতে কোনো জুয়াড়ি মাতালেরও দ্বিমত হবে না। মদ-জুয়ার আড্ডায় সাধারণত সমাজের গুণ্ডা, বদমায়েশ, চোর, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি অন্ধকার জগতের (under world) লোকেরাই এসে থাকে। বাইরে এদের অনেকে শিক্ষিত, সমাজপতি, বড় সরকারি চাকুরে বা ব্যবসায়ী হলেও এরা মূলত সমাজের অপরাধীদেরই অন্যতম। মদ মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলে। এ সময় জুয়ার হারজিতকে কেন্দ্র করে অতি সহজেই এদের মধ্যে মারামারি এমন কি খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মদের মত গাঁজা, আফিম, হিরোইন ইত্যাদি নেশার ওষুধ জাতীয় জিনিসও (Narcotics) মানুষকে নানারূপ অপরাধের সঙ্গে জড়িত করে। এক দল কুচক্রী প্রথমে নানা প্রলোভন দেখিয়ে যুবক-যুবতীদের এ সমস্ত নেশায় অভ্যস্ত করে। পরে যখন এরা সেই নেশার বস্তুর জন্য পাগলপ্রায় হয়ে উঠে, তখন এদের কাছ থেকে তার বিনিময়ে বহু টাকা উসুল করে বা তাদের দিয়ে নানারূপ অপরাধ করিয়ে নেয়। এ ধরনের ঘটনা যে কোনো আধুনিক দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মাঝে

মাঝে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মদ ও অন্যান্য নেশার বস্তু এবং জুয়ার কুফল যে কোনো দেশের পুলিশ রেকর্ড দেখলেই প্রমাণিত হবে।

(খ) মদ ও জুয়া আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত করে। এ কথাও কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মাতাল ও জুয়াড়ির মনে কেবল অশ্লীল কাজ, লালসা, টাকার লেনদেন ও জুয়ায় হারজিতের কথাই ঘুরপাক খায়। তার জন্য আল্লাহ বা নামাজের কথা ভাবার সময় কোথায়? আর এ দু'টো কাজ স্পষ্ট হারাম জেনেও যে তাতে লিপ্ত, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে বিশ্বাসই করে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে পাকিস্তানেও এ দু'টো অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর থেকে জানা গেল, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে ৪১,০৪৪ গ্যালন মদ আমদানি করা হতো; আর ১৯৬৫ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৪৪,৮৫১ গ্যালনে, যার দাম ১১,২৯,৯২৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৫৯,৫৮,৫৮১ টাকায় পৌঁছায়। অর্থাৎ গত ৭-৮ বছরে পাকিস্তানে মদের প্রচলন প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার। এ জঘন্য পাপ দূর করার জন্য কোরআন নির্দেশিত পথেই চেষ্টা করতে হবে। আশা করি এ আলোচনা দ্বারা আমাদের শিক্ষিত সমাজ মদ ও জুয়ার অপকারিতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশেও মদ-জুয়ার প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোরআনী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ব্যতীত এ অপরাধ রোধ করার অন্য কোনো পন্থা নেই। তাই পশ্চিমা জগত আজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও মদ ও জুয়া বন্ধ করতে অপারগ। ওসব দেশে মদের বিরুদ্ধে কেউ কেউ কথা বললেও জুয়া তাদের জাতীয় খেলা (Sports), ফলে জুয়ার সঙ্গে মদ থাকবেই। উন্নয়নকামী মুসলিম দেশগুলোর এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

কোরআনের দৃষ্টিতে যৌন-জীবন

٢:٢٢٢ — وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ لا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

(سورة البقرة — پ ٢ — ركوع ٢٨)

২ : ২২২— হে নবী! লোকেরা আপনাকে স্ত্রীলোকের ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তাদের বলে দিন— 'এটা এক প্রকার অসুস্থতা (১) ও অপবিত্রতা বিশেষ; সুতরাং ঋতুকালে স্ত্রী থেকে পৃথক (২) অবস্থান করো, এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী (৩) হয়ো না। তারপর তারা যখন পবিত্রতা লাভ করে, তখন আল্লাহ যে পথে আসতে আদেশ করেছেন সে পথে তাদের সঙ্গে মিলিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং শুচিতা প্রাপ্তদেরকেও ভালবাসেন। –(সূরা বাকারা, ২য় পারা, ২৮শ রুকু)

১. প্রত্যেক সুস্থ পূর্ণ-বয়স্ক নারী প্রতি চার সপ্তাহে একবার হায়েজ অবস্থায় থাকে এবং ৫/৭ দিন পর্যন্ত তাদের রক্তপাত হতে থাকে। প্রথম প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটাকে স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা হতো; কিন্তু এখন প্রমাণ হয়েছে, ঋতুস্রাব পেশাব পায়খানার মতো সম্পূর্ণ নিরাপদ বা দোষমুক্ত নয়। বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ (Gynaecologist) উইলফ্রিড শ' (Wilfrid Shaw) ১৯৪৮ সনে বলেন, 'স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের সময় কিছুটা অসুস্থতা (বিশেষ করে তলপেটে ব্যথা) প্রায়ই দেখা যায়।" অনেকের প্রাথমিক

ঋতুস্রাবের সময় ভীষণ পেটের ব্যথা হয়, অনেকের কিছুটা ব্যথা সারা জীবনই হতে থাকে। ডা. বোয়ান গ্রামা (১৯৫৫) লেখেছেন, "ঋতুর সময় রোগ ছড়াবার ও রোগাক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে .... কাজেই একে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শারীরবিদ্যাসম্মত (Physiological) বলা চলে না।"

সম্প্রতি বিখ্যাত ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে ডা. ক্যাথারিন ডাল্টন (Dalton, 1959, 1960a, 1961) নামক জনৈক মহিলা চিকিৎসকের পাঁচটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে তিনি ঋতুর সময় মেয়েদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। মেয়েদের হোস্টেল, হাসপাতাল, জেলখানা ও শিক্ষাগারে তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ঋতুর অব্যবহিত পূর্বে ও ঋতুর সময় মেয়েদের কার্যক্ষমতা ও কার্যকারিতা অনেক কমে যায়। এ সময় মেয়েদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব, অমনোযোগিতা, খেলাধুলা এড়িয়ে চলা ও বেশি কথা বলা ইত্যাদি অপরাধ ২৬% থেকে ৩৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যেসব মেয়ে স্বভাবতঃই দুষ্ট প্রকৃতির, তাদের অপরাধপ্রবণতা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। ডা. ডাল্টন আরো লেখেছেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়স্কা ১১ জন মনিটর (Prefect) ছিল, যাদের দুষ্টামির জন্য শাস্তি দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল। একটি প্রধান ও মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব মনিটর তাদের নিজেদের ঋতুর সময় শাস্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে থাকে এবং ঋতুর শুরুতে শাস্তির মাত্রা বাড়াতে থাকে, যা ধীরে ধীরে কমে যায়। এ প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও উঠে, এ অবস্থা কি সকল নারীর বেলায়ই প্রযোজ্য, বিশেষ করে শিক্ষয়িত্রী, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য শাসন বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত মহিলাদের বেলায়?* (Dalton, 1960c)

ডা. ডাল্টন আর এক জায়গায় লেখেছেন— "যদিও অতি উৎসাহীরা উভয় লিঙ্গের সমতার দাবি করে, তবু প্রকৃতি যে কোনো এক লিঙ্গের সবাইকেই সমতা দিতে রাজি নয়" (Dalton 1960b)। ঋতুর সময় মানসিক ধৈর্য ও মনের দৃঢ়তা রক্ষা করার ক্ষমতা সবার সমান হয় না বলেই তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনিয়স রাজ্যের ডা. গাইউলা জে. আরডেলই (Gyula J. Erdelyi) ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭২৯ জন হাঙ্গেরীয় মহিলা ক্রীড়াবিদের মধ্যে গবেষণা করে দেখিয়েছেন, ঋতুস্রাব তাদের ক্ষমতা

* Dalton, K. (1960c), Brit. Med. j. 2, 1947

প্রায়ই হ্রাস করে। তিনি আরও বলেন, "ঋতুর সময় আমি তাদের মান টেনিস ও নৌকা বাইচের ক্ষেত্রে অনেক নিম্নস্তরে নেমে যেতে দেখেছি।" (Time, December, 12, 1960, p, 40)। ঋতুকালকে কোরআনে 'اذًى' বলায় তার সার্থকতাই প্রমাণ করে। চৌদ্দশ বছর পূর্বে কোরআনে যে কথা বলা হয়েছে, তা আজ এত পরে বহু গবেষণায় সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কোরআনের বহুল যুক্তিপূর্ণ কথার মূল্য আশা করি এ আলোচনায় অনেকের নিকটই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ডা. ডাল্টনের মতে, রাষ্ট্রনায়ক তথা শাসন-ক্ষমতা সম্পন্ন পদে মেয়েদের নিযুক্ত করা ঠিক নয়।

২. ঋতুর সময় স্ত্রী-মিলন নিষিদ্ধ হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যনীতিসম্মত ও যুক্তিভিত্তিক। ঋতুর সময় জরায়ুর নিম্নমুখ স্বাভাবিক বন্ধ অবস্থায় থাকে না— তখন এর মুখ খোলা থাকে, ফলে রক্ত বের হতে পারে। ঋতুর রক্ত জরায়ুর গা থেকে ঝরে, কাজেই সেখানেও স্বাভাবিক আবরণ বা ঝিল্লি (Endometrium) অটুট থাকে না। ফলে এ সময় জরায়ু বা যৌনিনালীতে কোনো রোগজীবাণু থাকলে তাও সহজেই ভিতরে প্রবেশ করে এবং Endo-metritis (জরায়ু ঝিল্লি-প্রদাহ), Salpingitis (জরায়ুর নালীর প্রদাহ), Peritonitis (অন্ত্র আবরণী প্রদাহ) ও Pelvic cellulitis (তলপেটের প্রদাহ) ইত্যাদি কঠিন রোগ হবার আশঙ্কা থাকে। এ সময় স্ত্রী-সহবাস করলে এসব রোগের সম্ভাবনা বেশি। আবার স্ত্রীর গনোরিয়া, সিফিলিস, সিসটাইটিস (মূত্র-থলী প্রদাহ), শ্বেতপ্রদর (Leucorrhoea) ইত্যাদি রোগ থাকলে স্বামীর যৌন-অঙ্গে রোগ-জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা। সুতরাং স্বাস্থ্যগত কারণেই ঋতুর সময় সহবাস নিষিদ্ধ।

তা ছাড়া যৌন-মিলন নেহায়েতই উত্তেজনা-পূর্ণ ঘটনা, সে সময় সব রকম স্বাস্থ্য-বিধি পালন সম্ভব নয়। সুতরাং যখন জরায়ুর ঝিল্লি অটুট নয়, তখন পুরুষদের মাধ্যমে রোগ-জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা বেশি। যদি কেউ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে, তবুও স্ত্রীর রক্তপাতের ফলে সহবাস জঘন্য খুন-খারাবির মতো নিকৃষ্ট মানসিক অবস্থার প্রমাণ দেবে। তাই ডা. গ্রাহাম বলেন, "ঋতুর সময় মিলনে নিষেধ করার কারণ মানসিক নয়; বরং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্মত," কিন্তু শুধু রোগের ভয় বা ক্ষতির আশঙ্কা সব সময় মানুষকে অন্যায় থেকে ফেরাতে পারে না। তাতে পাপের জন্য আল্লাহর শাস্তির ভয় থাকলেই কেবল মানুষ তা থেকে বিরত হবে। তাই ইসলাম ঋতুর সময় স্ত্রী মিলন হারাম বা কঠিন গুনাহের কাজ বলে ঘোষণা করেছে।

৩. "তাদের নিকটবর্তী হয়ো না" বলতে যে শুধু যৌন-মিলনই বুঝায় তা বিশ্বস্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত। ইসলাম ঋতুবর্তী স্ত্রীকে অস্পৃশ্য করেনি; তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলে গেছেন, এ সময় স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসা, শোয়া, খাওয়া এমন কি আলিঙ্গন এবং চুম্বনও অন্যায় নয়। কেবল না-পাক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে হয় না, কিন্তু মুখস্থ দোআ দুরূদ, কেরাআত ইত্যাদি পড়া যায়। এর চেয়ে সহজ ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তব বিধান আর কি হতে পারে!

ইহুদী ও হিন্দুরা তাদের ঋতুবতী নারীদের যেরূপ অস্পৃশ্য করে রাখে, ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ নারীর অমর্যাদা খুবই অন্যায় ও জুলুম। ঋতুর রক্ত না-পাক, কিন্তু ঋতুবতী নারী কেন না-পাক হবে? তাহলে যেহেতু মল না-পাক আর প্রত্যেকের পেটেই মল আছে; সুতরাং সব মানুষই না-পাক হয়ে যাবে। শরীয়তের হুকুমে এসব মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি যে পর্যন্ত শরীরের ভিতরে থাকে ততক্ষণ শরীর পাক; বের হলেই না-পাক গণ্য করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কত সুন্দর ও যুক্তিসঙ্গত!

প্রমাণপঞ্জি

(1) Dalton, K, (1959) Brit Med. J. 1,1148

(2) ... K, (1960) 1,326

(3) ... K, (1960) 21,425

(4) ... K, (1960) 21,647

(5) ... K, (1961) 21,752

(6) Erdelyi, G. T. (1960) Time Newyork. Dec. 12 P. 40

(7) Graham, J. (1955), Any wife or Any Husband Heinimann, Lond P. 44

(8) Shaw, W, (1948) Text Book of Gynaecology Churchill Lond P. 106

٢٢٣ :٢ــ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَٰقُوهُ ط وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ٥ (سورة البقرة ــ ب ٢ ــ ركوع ٢٨)

২ : ২২৩— তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন কর[৪]; কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যতের[৫] জন্য যোগাড় করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। জেনে রেখো, একদিন তোমাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, আর আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ[৬] দিন। (সূরা বাকারা, ২য় পারা, ২৮শ রুকু)

৪. ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে স্ত্রী-সঙ্গমের ব্যাপারে নানারূপ মনগড়া কঠিন বিধি-নিষেধ রয়েছে; আর বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের জন্য বিয়ে না করাই উত্তম। সাবাতের দোহাই দিয়ে ইহুদীদের জন্য সহবাসের কঠিন শর্ত রয়েছে। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের বেলায় স্ত্রীর গায়ে কম্বল বা চাদর দিয়ে ঢেকে আচ্ছাদনের ছিদ্রপথে সহবাসের বিধি আছে। এসব কঠিন ও অবাস্তব বিধি অধিকাংশ লোকই পালন করে না। হিন্দু ধর্মে সংসারত্যাগ অতি পুণ্যের কাজ, কিন্তু ব্যভিচারকে অতি উদারভাবে গ্রহণ করা হয় (মহাভারতে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে), কিন্তু সহজ সরল ও বাস্তব জীবন-পদ্ধতি ইসলামে কোনোরূপ অসম্ভব বা অমূলক বিধান নেই। তাই এ আয়াতে বলা হচ্ছে, স্ত্রী শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, সেখানে সন্তানরূপ ফললাভ ও মানসিক শান্তিলাভ করার উদ্দেশ্যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই নির্দিষ্ট পথে উপগত হওয়া জায়েয। যদি কঠিন অবাস্তব বিধি-নিষেধ থাকে তবে তা ভঙ্গ হবার আশঙ্কাই অধিক এবং এর ফলে পাপ করার পর লজ্জা ও অনুশোচনা ভোগ করতে হয় মাত্র। সব রকম ব্যভিচারের দরজা দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে দিয়ে ইসলাম স্বামী স্ত্রীর মিলনে কোনোরূপ অহেতুক বাধা সৃষ্টি করেনি। স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনে মাত্র দুটি নিষেধ রয়েছে :

প্রথম, হায়েজ (ঋতু) ও নেফাসের (সন্তান জন্মের পর স্রাব) সময় স্ত্রী সঙ্গম হারাম; **দ্বিতীয়**, স্ত্রীর পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে সঙ্গম হারাম। এ ছাড়া আর কোনো বাধা-নিষেধের ঝামেলা নেই। এটাই বাস্তব ভিত্তিক।

৫. ভবিষ্যতের জন্য যোগাড় বলতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয় :

(ক) স্ত্রী-মিলন জায়েয করে দেয়া হয়েছে, কাজেই এতে যে বিরাট দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে সে বিষযে পূর্বাহ্নেই তৈরি থাকা উচিত। বিবাহ করে স্ত্রীর দায়িত্ব বহন করতে হবে।

(খ) স্ত্রী-মিলনের আনন্দে মশগুল হলেই চলবে না, পরকালের সম্বলও অর্জন করতে হবে। স্ত্রীর সাহচর্যে উৎফুল্ল হয়ে ইবাদতের কথা ভুলে গেলে মোটেই চলবে না, বরং বেশি করে শুকরিয়া আদায় করতে হবে। মনে রাখা দরকার, আল্লাহর পছন্দমতো চলে স্ত্রী-মিলনেও অশেষ সওয়াব হাসিল হয়। কি সুন্দর ব্যবস্থা।

(গ) মিলনের ফলে যে সন্তান আসতে পারে তার লালন-পালনের জন্য পূর্বেই হুশিয়ার থাকা উচিত। স্ত্রী-মিলনের সময় দোয়া পড়ে আল্লাহর দরগায় দোয়া করতে হবে যেন আল্লাহ সৎ সালেহ সন্তান দান করেন। কারণ এরূপ সন্তানই পৃথিবীতে নিজের স্থলাভিষিক্ত হলে সদকায়ে জারিয়ার কাজ হবে।

(ঘ) পরের যে মেয়েটি আজ নিয়ে আসা হলো, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ভরণ-পোষণ করতে হবে ও শরীয়ত নির্ধারিত যাবতীয় অধিকারও দিতে হবে। যে মেয়ে আজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদি সকল ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও নিজস্ব ১৫/২০ বছরের পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন সংসারে, নতুন পরিবেশে একমাত্র স্বামীর ভালবাসার আশায় চলে এসেছে, তার প্রতি প্রীতি, দয়া ও ভালবাসা দেখানো নিতান্ত মানবীয় কর্তব্য।

৬. বস্তুতঃ ইসলাম বিয়ের মারফত কেবল আনন্দের ব্যবস্থাই করেনি; বরং তাতে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছে। সকলকেই মনে রাখতে হবে, স্ত্রীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হবে, সন্তানদের প্রতি যে ব্যবহার করা হবে, এসবেরই পুরাপুরি হিসাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতে হবে। মুমেনদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, বিয়ে এবং স্ত্রী মিলনও সওয়াবের কাজ।

٢٢٨ : ٢ ـ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ط
وَلَايَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(سورة البقرة ــ پ ٢ ــ ركوع ٢٨)

২ : ২২৮ — তালাকী স্ত্রীগণ তিন ঋতুকাল পর্যন্ত[৭] (বিবাহ থেকে) নিবৃত্ত থাকবে। আর যদি তারা সত্যি আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে তবে তাদের জন্য তাদের গর্ভ অবস্থার[৮] কথা গোপন করা অন্যায়। যদি তাদের স্বামী আবার আপোষ করতে চায়, তবে সেই সময়ের মধ্যে তাদের সে অধিকার[৯] থাকবে। নারীদের উপর পুরুষদের যেরূপ অধিকার রয়েছে, নারীরও পুরুষদের উপর তদ্রূপ অধিকার রয়েছে— তবে নারীদের উপর পুরুষের একটা বিশেষ পদমর্যাদা[১০] বা দরজা রয়েছে। আর আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি পরাক্রমশীল ও সুবিবেচক[১১]। —(সূরা বাকারা, ২য় পারা, ২৮শ রুকু)

৭. তালাকের পর যে ইদ্দত পালন করতে হয় তা তিন ঋতু (Menstruation) পর্যন্ত, কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন নয়। এখানে বলা হচ্ছে, তিন ঋতু পার হলে স্ত্রী পুনরায় অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। স্ত্রীদের বেলায় এ নিয়ম করার বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য পরবর্তী কালের সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে মতভেদ হবার আশঙ্কা দূর করা। যদি তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে এবং তা খুব প্রাথমিক অবস্থা হয়, তবে ঋতু বন্ধ হয়ে গেলেই তা বুঝা যাবে, কিন্তু যদি পর পর তিন ঋতুস্রাব হয় তবে নিশ্চয়ই গর্ভে কোনো সন্তান ছিল না। যদি গর্ভে কোনো সন্তান থাকে তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর নেফাস থেকে পাক না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ না-জায়েয। তিন ঋতুর উদ্দেশ্য গর্ভ সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর করা, কারণ গর্ভ অবস্থায়ও প্রথম দিকে একবার কি দু'বার স্রাব হতে পারে, কিন্তু তৃতীয় স্রাবের পর আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এটা স্বাস্থ্য-বিদ্যা অনুযায়ী সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। যদি তালাকের পরদিনই প্রথম ঋতু হয়, তবে মাত্র ৫৬ দিনেই ইদ্দত শেষ হতে পারে। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট সময় না বলে তিনি ইদ্দত বলাই যুক্তিসঙ্গত। তিন ঋতু পার হলে Super faecundation বা Super faetation প্রভৃতি আইনগত (Medico-legal) সমস্যার আশঙ্কা থাকে না। কোরআনের এ আয়াত যে কোনো চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোককে অনুপ্রাণিত করবে।

৮. তালাকের পর ইদ্দতের ব্যাপারে দিন কমানোর জন্য স্ত্রী যদি ঋতুর কথা মিথ্যা বলে বা তার গর্ভে সন্তান থাকার কথা গোপন করে, তবে তার কঠিন

গুনাহ্ হবে। ঋতু হল কি হল না এর একমাত্র প্রমাণ সেই স্ত্রীলোকের নিজের সাক্ষ্য। এর আর কোনো প্রমাণ জোগাড় করা বাস্তবভিত্তিক নয়। তা ছাড়া পেটের সন্তান গোপন করে পুনরায় বিয়ে করার অপচেষ্টাও আল্লাহর অজ্ঞাত থাকবে না। পরকালের বিচারের ভয়-ই পাপ থেকে সরে থাকার একমাত্র সফল উপায়।

৯. যদি তালাক এক কি দু'বার দেয়া হয়, তবে প্রত্যেক তালাকের পর তিন ঋতু পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী পৃথক থাকবে। যদি এর মধ্যে আপোষ করা সম্ভব হয়, তবে তাদের পুনর্মিলন জায়েয, কিন্তু তা যদি না হয়, তবে তিন ঋতুর পর স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। স্বামী তিন ঋতুর মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে তার অধিকার সর্বাগ্রে, কারণ তালাক না হওয়াই কাম্য, অবশ্য যদি স্ত্রীও তাই চায়।

১০. مثل দ্বারা অনুরূপ (Similar) বুঝায়, এক প্রকার বুঝায় না। এ আয়াতে ইসলাম যে নর-নারীর সমান মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে সে কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু সমান অধিকার দ্বারা একইরূপ কাজের অধিকার বুঝায় না। আজ-কালকার তথাকথিত নারী প্রগতিবাদীরা নর-নারীর কর্মক্ষেত্র এক মনে করে বহু সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে চলেছে। সমান অধিকার সত্ত্বেও স্বামীর গর্ভধারণ সম্ভব নয়, বা স্ত্রীর গর্ভদানের ক্ষমতা নেই। নর-নারীর কর্মক্ষেত্র আলাদা, কিন্তু আইনের চোখে তাদের উভয়ের সম্মান ও অধিকার এক। ইসলাম স্বামীকে বহু বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে বলতে— স্বামীর অধিক দায়িত্ব কর্তব্যই বুঝায়। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, এটাই বেশি মর্যাদার বা দরজার প্রকৃত অর্থ। পূর্ণ নেতৃত নের ক্ষমতা আল্লাহ্ পুরুষকেই দিয়েছেন, এ ব্যবস্থায় নারীদেরকে মোটেই ছোট করা হয়নি। অন্য কোনো ধর্ম নারীকে কোনো মানবীয় অধিকারই দেয়নি— এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা তো নারীদেরকে পুরুষের লালসার শিকারে পরিণত করে তাদেরকে মিথ্যা মর্যাদার মুখোশ পরিয়ে দিয়ে নারীত্বের চরম অমর্যাদা করে চলেছে। ইসলামই নারীকে প্রয়োজনীয় অধিকার দিয়েছে। সকল সুসভ্য সমাজেই পুরুষের সমাজ-নেতৃত্ব বর্তমান। এটাই স্রষ্টার নিয়ম, আর এতেই শান্তি।

১১. যদি নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়ে পুরুষ অবলা নারীর প্রতি যুলুম করে তবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ্ তোমার চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও জ্ঞানী। তিনিই তোমার বিচার করবেন। আর স্ত্রীদেরও মনে রাখা দরকার, আইন যিনি করেছেন তিনি অতি বিজ্ঞ ও সুবিচারক।

٢٣ : ٢ ـــ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا

يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج فَاِذَا بَلَغْنَ

اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(سورة البقرة ـــ پ ٢ ـــ ركوع ٣٠)

২ : ২৩৪—— তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীগণ জীবিত থাকে, তবে তারা চার মাস দশ দিন[১২] (বিবাহ থেকে) বিরত থাকবে। যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে বিধি-সম্মতভাবে যে ব্যবস্থা করতে চায় তা করার অধিকার থাকবে, এতে তোমাদের কোনো দোষ হবে না। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।

(সূরা বাকারা, ২য় পারা, ৩০শ রুকু)

১২. বিধবা নারীর ইদ্দত চার মাস দশ দিন করা হয়েছে এবং এটাও খুব যুক্তিসঙ্গত। এতে তিন ঋতুকাল ছাড়াও বেশিদিন অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, কারণ এতে গর্ভস্থ সম্ভাব্য সন্তান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া ছাড়াও শোক প্রকাশ করার উদ্দেশ্যও নিহিত। বিবাহ ছেলেখেলা নয়, কাজেই স্বামীর মৃত্যুর পর শীঘ্র পুনর্বিবাহ করা দৃষ্টিকটু।

এ প্রসঙ্গে স্বামীর বেলায় যদিও কোনো বাধানিষেধ নেই, তবে যতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ব্যভিচার করার মতো আশঙ্কা না হবে, অন্তত সেরূপ সময় দেরি করা সুন্দর। নতুবা স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (২/১ মাসের মধ্যে) দ্বিতীয় বিবাহ করা খুবই দৃষ্টিকটু। স্বামীদেরকে পরিবার তথা সমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে; তাই তাদেরকে অধিক স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। তাদের কাজের বিচার হবে একথাও মনে রাখতে হবে।

৪ : ৩ — وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝ (سورة النساء — ٤پ — ركوع ١)

৪ : ৩— তোমরা যদি এতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না বলে আশঙ্কা কর, তাহলে তোমাদের পছন্দমতো নারীদের মধ্য থেকে দুই, তিন বা চার জনকে বিবাহ কর, কিন্তু যদি তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না বলে আশঙ্কা কর, তবে মাত্র একজন[১৩] স্ত্রীই গ্রহণ কর, অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত নারীদেরকে বিবাহ কর[১৪]। অবিচার থেকে আত্মরক্ষা করার ইহাই সঠিক পন্থা। (সূরা নিসা, ৪র্থ পারা, ১ম রুকু)

১৩. সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা ইসলামের প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলীর অন্যতম। এর জন্য প্রয়োজন সমাজে ইনসাফ বা সুবিচার প্রতিষ্ঠা; যাতে জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র ও সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সকলে নিজ নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। এতিম বালক-বালিকা সমাজের সবচেয়ে অসহায় ও দুর্বলতার প্রতীক। এদের প্রতি যাতে ইনসাফ করা হয় এবং তাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং যতদিন তারা নিজের ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতা অর্জন না করে ততদিন পর্যন্ত তাদের সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ইসলাম খুব জোর তাকিদ দিয়েছে (৪ : ২)।

এতিমদের প্রতি সুবিচার ইসলামী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে মুসলমান পুরুষকে সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাও বিনা শর্তে নয়। সেই শর্তগুলোও এ আয়াতের বর্ণিত বিষয়। এতিমদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও বহু বিবাহের কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে কয়েক রকম মত আছে :

(ক) হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে প্রাক-ইসলামী অন্ধকার যুগে আরবে নিঃসহায় এতিম বালিকাদের (অন্যান্য দেশেও বটে) রূপ ও সম্পদের লোভে বিত্তশালী, প্রভাবশালী আত্মীয় বা সমাজপতিরা তাদেরকে বিয়ে করতো এবং পরে তাদের সম্পদ দখল করে তাদের প্রতি নানারূপ যুলুম-নির্যাতন করে

তাড়িয়ে দিত। তাই আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, যদি তোমাদের পক্ষে এতিম বালিকাদের (বালিকা বলতে বিবাহযোগ্য কুমারীকেও বুঝায়) প্রতি সুবিচার করা সম্ভব না হয়, তবে তাদেরকে লোভের বশে বিয়ে করো না। যদি বিয়ে করতেই হয়, তবে দেশে আরও বহু মেয়ে আছে, তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে পছন্দ হয় চার জন পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। তবে যদি একাধিক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না বলে আশঙ্কা কর, তবে এক বিয়েই করবে।

(খ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য বিবাহের সীমা সুবিচারের শর্তসাপেক্ষে চার পর্যন্ত নির্ধারিত করা। জাহেলিয়াত যুগে বহু স্ত্রী গ্রহণ করার রেওয়াজ ছিল এবং এর দ্বারা সম্পদশালী এতিমদেরকে বিয়ে করে ধনী হবার সুযোগ অনেকেই তালাশ করতো। তাই চার জনের বেশি বিয়ে নিষেধ করা হয়েছে; আর চার জনের জন্যও সুবিচারের শর্ত রয়েছে।

(গ) সায়ীদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন যে, জাহেলিয়াত যুগেও এতিমদের প্রতি সুবিচার করা ভাল কাজ মনে করা হতো; কিন্তু নারীদের প্রতি সুবিচারের কোনো প্রয়োজন তারা মনে করতো না, তখন তারা যত ইচ্ছা বিয়ে করত এবং তাদের প্রতি ইনসাফ ও শালীনতার সঙ্গে ব্যবহার করতো না। তাই আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, নারীদের প্রতিও সুবিচার করতে হবে এবং কেবল এ শর্তেই ঊর্ধ্বপক্ষে চার জন পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েয হবে।

(ঘ) মাওলানা মওদূদী (র.)-এর মতে, উপরের তিনটি ব্যাখ্যাই এক সঙ্গে গ্রহণযোগ্য এবং তদুপরি তিনি আরও এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদি এতিম ছেলেমেয়ে ও তাদের বিধবা মা সমাজে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে না পারে, বা সেরূপ ব্যবস্থা সমাজে সম্ভব না হয়, তবে এতিমদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত বিধবা স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে চার জন পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েয। এতে এতিমদের প্রতি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য যদি সুবিচার করতে না পার তবে এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাক।

সুতরাং এ আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সমাজে বিধবা ও এতিমের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় (এতে বিবাহযোগ্যা এতিম বালিকাকেও বুঝাবে), এদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করার প্রয়োজনে চার জন পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েয অথবা সুবিচার না করার আশঙ্কা থাকলে এদেরকে বাদ দিয়ে অন্য নারীকে বিয়ে করা উচিত। এ আয়াত ওহুদ যুদ্ধের পর বিধবা ও এতিম বালক বালিকার সমস্যার সমাধানকল্পে নাযিল হয়, কিন্তু কোরআনের আয়াত শাশ্বত ও চিরন্তন এবং সর্বকালে প্রযোজ্য। এখনও এতিম ছেলেমেয়ে বা বিধবা নারীর প্রতি সদ্ব্যবহার

করার উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ের প্রয়োজন হতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে এবং উদ্বাস্তু সমস্যা জর্জরিত পাক-ভারতে বহু বিধবা ও এতিম সমাজের গলগ্রহ হয়ে রয়েছে। এদেরকে পুর্নবাসন করার অন্যতম সুষ্ঠু উপায় বহু বিবাহ জারেয রাখা, কিন্তু ব্যভিচারে জর্জরিত পাশ্চাত্য সভ্যতা তা সহ্য করবে না; কারণ তারা ইসলামের কঠিন শর্তসহ চার বিবাহ করবে না; বরং এক বিয়ের আড়ালে অসংখ্য নারী ভোগ করবে। আজ সেসব দেশে ব্যভিচার বেশি বেড়ে গেছে এবং এটাই তার একমাত্র সমাধান তাদের মানব-রচিত আইনের সমাজে। পাশ্চাত্য দেশে ব্যভিচারের জন্য ব্যবহৃত নারীদের বিগত যৌবন অবস্থায় রক্ষাণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। নাইট ক্লাব, ফলিজ বাজারী পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি রাষ্ট্রানুকূল্যে চালিত হলেও দুঃসময় রাষ্ট্র এদের দেখাশুনার দায়িত্ব নেয় না। ইসলাম একাধিক বিবাহিত নারীকেই সমান মর্যাদা ও সামাজিক অধিকার দিতে বাধ্য করে। ইসলাম বহু বিবাহের অনুমতি দেয় মাত্র, এটা কখনও অবশ্য কর্তব্য বা ফরয নয়। কেবল প্রয়োজন হলেই এবং শর্ত পূরণ করার ক্ষমতা থাকলেই তা করা যাবে। বহু বিবাহ ব্যভিচার থেকে লক্ষগুলো ভাল। যুদ্ধবিগ্রহের পর বিধবাদের যৌন সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াও কালো মেয়ে, গরীব বাপের মেয়ে, অশিক্ষিত, কুরূপা মেয়ে ইত্যাদিও অনেক সময় বিবাহের অভাবে সমাজের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। একটিমাত্র বিয়ে করতে বাধ্য হলে কেউ এদেরকে বিয়ে করতে রাজি হবে না; কিন্তু সুবিচারের শর্তে বহু বিবাহ চালু থাকলে এসব মেয়েও সমাজে সম্মান ও অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। নতুবা সমাজে পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার, নাইট ক্লাব ও তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করার এই কুফল যে কোনো আধুনিক সমাজেই স্পষ্ট দেখা যায়। বর্তমান যুগে দু'টি ব্যাপারে আইন হওয়া উচিত :

এক : নারীর অমতে বিয়ে দেয়া চলবে না, যা আল্লাহর হুকুম। এ নিয়ম কঠোরভাবে মানতে হবে। তাতে জোর করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ বন্ধ হবে।

দুই : বয়স্ক লোকের নিকট অল্প বয়স্ক মেয়ের বিয়ে দেয়া চলবে না। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান কিছুতেই সর্বোচ্চ ১৫ বছরের বেশি হবে না, তবে কমপক্ষে ৫—১০ বছরের ব্যবধানই উত্তম। বৃদ্ধ লোকের যুবতী বিয়ে করার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যভিচারের প্রসার ও মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি।

বহু বিবাহের আরও যুক্তি আছে। যেমন— স্বামীর যৌন-ক্ষমতা বেশি হলে, স্ত্রীর হায়েজ নেফাসের সময় যৌন-মিলনের অভাবে জেনা করার আশঙ্কা থাকলে

(যা খুব কম লোকেরই হবে), স্ত্রীর দূরারোগ্য ব্যাধি হলে, যার ফলে যৌন-মিলন সম্ভব নয়, স্ত্রীর দোষে সন্তানলাভ অসম্ভব হলেও বহু বিবাহ করার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু মনে রাখা দরকার, উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ এবং আল্লাহ অন্তরের খবরও জানেন।

সবশেষে মনে রাখা দরকার, একটি মাত্র বিয়ে করাই সাধারণ নিয়ম— বহু বিবাহ শর্তসাপেক্ষে জায়েযমাত্র, কিন্তু ইনসাফ না করার সামান্যতম আশঙ্কা থাকলেও এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট হতে হবে। আর বর্তমানেও আমাদের সমাজে তাই বহু বিবাহ খুবই অল্প।

১৪. দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত বলতে জিহাদের বন্দিনীদের কথা বলা হয়েছে, প্রাক-ইসলাম যুগের ক্রীতদাসী নয়। জিহাদে বন্দীকৃত নর-নারী ব্যতীত অন্য কোনোরূপ দাস-দাসী ইসলামে জায়েয নয়। ইসলামের মতো উদার ও সত্য ধর্মেও কেন দাস প্রথা জায়েয আছে, তার জবাবে বলতে হয়, চিরকালই মানব সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে এবং যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, তারও চিরস্থায়ী বিধান ইসলামে থাকতে হবে। জার্মান, ইংরেজ, আমেরিকান, জাপানি, রাশিয়ান ও চীনা ইত্যাদি জাতি তাদের যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি যে ব্যবহার করছে তা অমানুষিকতা ও বর্বরতার প্রকৃষ্ট নমুনা। গত দুই মহাযুদ্ধে এবং অন্যান্য খণ্ডযুদ্ধে তথাকথিত 'জেনেভা কনভেনশনের' কি মর্যাদা তা সবার জানা আছে। ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সুবিচার ও সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়। নারী বন্দীর বেলায় বিয়ে করার অনুমতি এ আয়াতে দেয়া হলো। দাসদের প্রতি সদ্ব্যবহার কি ভাবে করা উচিত সে সম্বন্ধে ইসলামের ইতিহাসই উজ্জ্বলতম নমুনা। ইসলামের ন্যায়নীতি ক্রীতদাস বেলাল, খাব্বাব, আম্মার, জায়েদকে হযরতে বদলে দিয়েছে, দাসের নিকট নিকটাত্মীয়ের বিয়ে দিয়েছে, যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি করেছে এবং একত্রে খাওয়া-পরা ও একই পোশাকের ব্যবস্থা করেছে। পরবর্তীকালে মুসলমানগণ পাক-ভারতের ইতিহাসে দাস বংশের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ও রচনা করেছিল। পক্ষান্তরে জর্জ ওয়াশিংটন, লিংকন, কেনেডি বা জনসন আইনত দাস-প্রথা রদ করেও নিগ্রোদের মানুষের অধিকার দিচ্ছে না বা দিতে পারছে না।

এখানে বলা হচ্ছে, যদি কারো পক্ষে একটি স্বাধীন স্ত্রীও বিয়ে করা সম্ভব না হয় (প্রধানত আর্থিক কারণে), তবে সে যেন জ্বেনার বদলে দাসীকে বিয়ে করে পাপ থেকে বেঁচে থাকে। এরা যেন এতিমদেরকে বিয়ে করে অবিচার না করে। দাসী বিয়েতে দায়িত্ব কম এবং খরচও কম।

বর্তমানে দাস-দাসী নেই, তবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ ব্যাপক করলে বলা যায়, আজও যদি কেউ সঙ্গতির অভাবে উপযুক্ত ঘরে বিয়ে করতে না পারে, তবে সে নিচু ঘরে তথা গরিব দুঃস্থ মেয়েদেরকে বিয়ে করে নিজেকে জ্বেনার পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আর যদি কেউ একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন বোধ করে অথচ তা করার সঙ্গতি না থাকে, তবে সে গরিব দুঃস্থ বা চাকরানী জাতীয় মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বন্দিনীদের তুলনা হবে না। কারণ এরা সমান মর্যাদার মুসলিম স্বাধীনা-নারী, আর যুদ্ধ-বন্দিনী দুশমনের বংশ এবং মুসলমানদের তথা মানবতার শত্রু।

১৫ : ৪ — وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْيَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا○

(سورة النساء — پ ۴ - ركوع ۳)

৪ : ১৫— তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী আহ্বান কর এবং এরা যদি (অপরাধের বিষয়ে) সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সেই নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্য অন্য কোনো পথ নির্দেশ করেন[১৫]। (সূরা নিসা, ৪র্থ পারা, ৩য় রুকু)

১৫. এ আয়াতে 'জ্বেনা' বা ব্যভিচার দূর করার উদ্দেশ্যে শাস্তির প্রাথমিক বিধান নাযিল করা হয়। কোনো স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করলেই চলবে না, তার সপক্ষে অন্তত চার জন সাক্ষীও থাকতে হবে, নতুবা তা ইসলামী আইনে অগ্রাহ্য। এ বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য নারীদের উপর মিথ্যা অপবাদ আনতে বাধা দেয়া। অবশ্য সাক্ষী না থাকলে অপরাধ করেও কেউ শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু তাতে তার অপরাধ দূর হবে না, কারণ আল্লাহ সব জানেন ও দেখেন এবং তার নিকট বিচারার্থ সবাইকে একদিন হাজির হতে হবে। শরীয়তের আইনের উদ্দেশ্য সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। যদি উপযুক্ত সাক্ষী দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত হয়, তবে ব্যভিচারকারী নারীকে কোনো ঘরে যাবজ্জীবন আটক রাখতে বলা হয়েছে, কিন্তু আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়ে

আরও নির্দেশ আসবে এরূপ পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং জ্বেনার শাস্তির পূর্ণ আয়াত নাযিল হবার পূর্বে এ আটক রাখা বা জেল দেয়া নেহায়েতই সাময়িক ব্যবস্থা ছিল। মদ্যপানের মতো এ অপরাধও ধীরে ধীরে দূর করার প্রচেষ্টাই যুক্তিসঙ্গত। তাই প্রথমত মিথ্যা অপবাদ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চার জন সাক্ষী যোগাড় করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কঠিন শর্ত করার উদ্দেশ্য নারীর মর্যাদা রক্ষা করা; কারণ তারা অতীব দুর্বল এবং অনেক সময় পুরুষরা অন্যায় অত্যাচার অবিচার করে থাকে। তারপর প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল অপরাধী নারীকে কোনো গৃহে আটকের ব্যবস্থা দেয়া হয়। পুরুষ অপরাধীর শাস্তির কথা পরবর্তী আয়াতেই দেয়া হচ্ছে। আর জ্বেনার শাস্তির পূর্ণ বিবরণ পরে সূরা আন নূরে দেয়া (নাযিল) হয়েছে (২৪ : ২)।

١٦ : ٤ — وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

(سورة النساء — پ ٤ - ركوع ٣)

৪ : ১৬— আর তোমাদের মধ্যে যে দু'জন ব্যভিচার করবে তাদের উভয়কেই[১৬] শাস্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের উভয় থেকে বিরত হও[১৭] (নিষ্কৃতি দাও); কেননা আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

—(সূরা নিসা, ৪র্থ পারা, ৩য় রুকু)

১৬. ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সকল বিষয়ে ইনসাফ বা ন্যায়নীতি অনুসরণ করা। তাই ব্যভিচারকারী নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান শাস্তি দিতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীর লেখক ৪ : ১৫ আয়াতের الّتى ও ৪ : ১৬ আয়াতের الذان শব্দের আভিধানিক অর্থ ধরে ১৫ আয়াতে কেবল দু'টি মেয়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ ও ১৬ আয়াতে দু'জন পুরুষের মধ্যে অশ্লীল কাজের (সমকামিতা) শাস্তির কথা বলা হয়েছে বলে মনে করেন, কিন্তু তাতে দুটি আয়াতের সামঞ্জস্য ব্যাহত হয়। আর তা ঠিক হলে الّتى-এর বদলে التان

ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সকল ভাষায়ই সে বা তারা বলতে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করলেও স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য তাফসীরকার ১৫ ও ১৬ আয়াতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় অপরাধীর কথা বলা হয়েছে বলে স্বীকার করে থাকেন। ১৫ নং আয়াতে চার জন সাক্ষীর উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে, আর তা নারীর বেলায়ই বেশি প্রয়োজন। তাই এ আয়াতে সাক্ষীর কথা নারীর পক্ষে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, কিন্তু বুঝতে কোনোরূপ অসুবিধা দূর করার জন্য পরের আয়াতে উভয় অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এবং এখানে পুরুষকে বুঝাবার জন্য পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে; কারণ নারীর কথা পূর্বের আয়াতেই বলা হয়েছে। আর উভয় লিঙ্গের কথা বলতে হলে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করাই সকল ভাষার রীতি। যদি ১৫ আয়াতে নারী সমকামী ও ১৬ আয়াতে পুরুষ সমকামীকে বুঝানো হয়ে থাকত, তবে এ দুই শাস্তির মধ্যে তারতম্য থাকত না, আর কেবল পুরুষের বেলায় তওবার সুযোগ দেয়া হতো না; কারণ আল্লাহ সূক্ষ্ম বিচারক। এরপর সূরা আন নূরে পুরুষ ও নারী জেনাকারীদের জন্য একইরূপ শাস্তির কথা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

১৭. যারা অজ্ঞানতাবশত বা রিপুর তাড়নায় পাপ করে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং সংশোধিত জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞা করে, তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সুযোগ দিতে হবে। যদি তারা সংশোধিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে হবে। এটাই দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহর বিধান। অবশ্য এ তওবা ও সংশোধন দিল থেকে হতে হবে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী দুই আয়াতে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সুতরাং সমাজের যেসব যুবক-যুবতী ক্ষণিকের মোহে জেনার মতো জঘন্য অপরাধ করে বসে, তখন তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে জেলে না দিয়ে 'ঈযা' বা তিরস্কার ও কিছু শারীরিক শাস্তি দিয়ে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত। তাই এ সময় তাদেরকে বাড়িতে থাকতে বাধ্য করে কড়া নজরে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। আর তাদেরকে এ অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তওবা করার জন্য শিক্ষা ও উপদেশ দিতে হবে। যদি তারা অনুতপ্ত হয়, তওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে নেক জীবনযাপন করতে তৎপর হয়, তবে তাদের আর শাস্তি দেয়া বা সমাজে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত বলে নির্দিষ্ট করে রাখা খুবই অন্যায়। কারণ ক্ষমা না করলে মানুষ ভাল হবে কি করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীলদের পছন্দ করেন, কিন্তু যদি অনুতপ্ত বা সংশোধিত না হয় বা তওবা করার পর আবার অপরাধে লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে; তখন তারা ক্ষমার অযোগ্য। এ ক্ষমার সীমা নির্ধারিত হয়েছে ৪ : ১৭—১৮ আয়াতে।

۱۲۹ : ۴ ـــ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْآ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ
حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ
تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا٥

(سورة النساء ــ پ ۵ ــ رکوع ۱۹)

৪ : ১২৯— যদিও তোমরা শত চেষ্টা কর তবুও স্ত্রীদের মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়[১৮], তবু একজন স্ত্রীকে অবহেলা করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকো না এবং তাকে এমনভাবে পরিত্যাগ করো না যেন তাকে ঝুলিয়ে রেখেছ। যদি তোমরা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতায়[১৯] আসতে পার এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই যথেষ্ট দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

—(সূরা নিসা, ৫ম পারা, ১৯শ রুকু)

১৮. ৪ : ৩ আয়াতে যে বহু বিবাহ জায়েয করা হয়েছে তা সমান ব্যবহার করার শর্তে, কিন্তু মানুষ চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সমান আচরণ করতে সমর্থ হবে না। যদি দ্বিতীয় স্ত্রী কম বয়স্ক বা অধিক সুন্দরী হয়, তবে স্বভাবতই তার প্রতি মনের টান বেশি হবে। মানুষের এ দুর্বলতা আল্লাহর জানা আছে। সুতরাং ৪ : ৩ : ও ৪ : ১২৯ আয়াত একত্রে পাঠ করলে মনে হয়, নেহায়েত প্রয়োজন না হলে একাধিক বিয়ে করা উচিত নয়; আর তা-ই আল্লাহর আয়াতের উদ্দেশ্য। সমাজের বিশেষ অবস্থায় এবং ব্যক্তিগত বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা ইসলাম পছন্দ করে না। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা ইত্যাদি কোনো কারণে বহু বিবাহযোগ্যা নারী থাকলে তাদেরকে অশ্লীল জীবনযাপন থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বহু বিবাহের অনুমতি রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা করবে তারও সাধ্যমতো সমান ব্যবহার করার কথা স্বীকার করে নিতে হবে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ কারণে শান্তির সময়ও বহু বিবাহ চলতে পারে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

এক : স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হলে যদি স্বাভাবিক যৌন জীবন সম্ভব না হয়।

দুই : স্ত্রীর যৌন-অঙ্গের বিকৃতি— যেমন, যৌন-সংকোচন (Vagiral stricture) যা সন্তান জন্মের সময় ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে হতে পারে।

তিন : স্ত্রীর কোনোরূপ যৌন-উত্তেজনা না হলে (Frigid) যদি স্বামীর উত্তেজনা স্বাভাবিক হয়।

চার : স্ত্রীর ব্যাধি বা দোষের ফলে– যেমন, ক্ষুদ্রজরায়ু (maldeveloped uterus) ইত্যাদির ফলে যদি সন্তান ধারণ করা সম্ভব না হয়, আর স্বামীর কোনো দোষ না থাকে, তখন সন্তানলাভের প্রয়োজনে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। তবে সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ব্যতিরেকে দু'য়ের বেশি স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজন অতি সীমিত।

পাঁচ : যদি কোনো পুরুষের অস্বাভাবিক যৌন-ক্ষুধা থাকে, তবে বহু বিবাহের প্রয়োজন হতে পারে।

সবশেষে একথা মনে রাখা দরকার, 'জ্বেনা' করার আশঙ্কা থাকলেই কোনো পুরুষ একত্রে একাধিক বিয়ে করবে, কারণ একাধিক স্ত্রীর সংসার সাধারণত সুখের হয় না।

যদি স্বামীর এমন দোষ থাকে যার জন্য স্ত্রীর যৌন-জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে, তবে স্ত্রী তালাকে 'তাফউইয' আদায় করে ইদ্দতান্তে অন্য স্বামী গ্রহণ করার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। যদি একজনের দোষ থাকা সত্ত্বেও অন্যজন জ্বেনা না করে পরস্পরকে ভালবেসে বসবাস করতে পারে এবং বহু বিবাহ না করে, তবে তাতেও কোনো দোষ নেই। তবে সব ব্যাপারেই আল্লাহ নিয়ত দেখবেন।

১৯. ৪ : ৩ আয়াতে যে সমান ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে, সেই সমান ব্যবহারের সংজ্ঞা এ আয়াতাংশে দেয়া হয়েছে। যৌন ব্যাপারে সমান আকর্ষণ অনুভব করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু জ্ঞাতসারে কোনো ব্যাপারে কোনো এক স্ত্রীকে অবহেলা করা চলবে না। সতীনের সঙ্গে সমঝোতায় এসে মিলে-মিশে চলার চেষ্টা করলেই শান্তি সম্ভব। আল্লাহর বিচারের ভয় থাকলেই কোনো পুরুষ তার একাধিক স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করতে সাহস পাবে না। সমান ব্যবহার (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাহ্যিক) করার আন্তরিক চেষ্টা করলেই আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন।

৫ : ৫ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ

أٰتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ
أَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِي
الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ (سورة المائدة ــ پ ٦ ــ ركوع ١)

৫ : ৫— আজ তোমাদের জন্য সকল পবিত্র জিনিস হালাল করা হলো। (পূর্ববর্তী) আহলে কিতাবদের খাদ্য[২০] তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য সাধ্বী মোমেনা স্ত্রীলোক হালাল এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের সাধ্বী স্ত্রীলোকও[২১] হালাল, তবে তাদেরকে উপযুক্ত মহরানা দিতে হবে এবং সতীত্বই উদ্দেশ্য হতে হবে, যৌন ব্যভিচার নয় এবং গোপন অভিসারও নয়। যে ব্যক্তি কুফরী করে তার সকল কাজ ব্যর্থ হবে এবং আখেরাতের দিন সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।

—(সূরা মায়েদা, ৬ষ্ঠ পারা, ১ম রুকু)।

২০. মুসলমানদের জন্য কোনো কোনো খাদ্যদ্রব্য হালাল ও পবিত্র সে বিষয় কোরআনে বিস্তারিত বলা হয়েছে, যা খাদ্যের হালাল ও হারাম বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে (টীকা-১, ৩—৬, ১৬—২১ ও ২৩)। আহলে কিতাবদের তৈরি খাদ্য সম্বন্ধেও হালাল-হারাম বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (টীকা নং ২৫)।

২১. ইসলাম মুসলমান পুরুষের জন্য পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের সাধ্বী নারী বিয়ে জায়েয রয়েছে। পূর্ববর্তী ইহুদী ও খ্রিস্টান ছাড়া আর কেউ আহলে কিতাব বলে প্রমাণিত নয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, কম্যুনিস্ট, কনফুসীয়, শিন্টো, শিখ, জৈন ইত্যাদি আহলে কিতাব নয়। পার্সিদের সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। সুতরাং কেবল পূর্ববর্তী ইহুদী ও খ্রিস্টান মেয়েই বিয়ে করা চলবে, কিন্তু ওদের কাছে মুসলমানের মেয়ে বিয়ে দেয়া হারাম হবে, কিন্তু আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, সতী নারী হলেই মহরানা দিয়ে এরূপ বিয়ে জায়েয, ব্যভিচার ও যৌন-লালসার মোহে বিয়ে করা চলবে না; এ ছাড়া গোপন অভিসার এবং যৌন-মিলনও হারাম। মনে রাখা দরকার, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা কোর্টশীপ (courtship) প্রথার মাধ্যমে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে, ওদের মধ্যে যৌন-সতীত্ব অতি দুর্লভ। এমতাবস্থায় ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে ইসলামী পরিভাষায় সতী-সাধ্বী মোমেনা বা محصنت

কিনা তা খুব ভেবে দেখা প্রয়োজন। আজকালের ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা পূর্ববর্তী সেই আহলে কিতাব নয়; অধিকাংশ আলেমের মতে, তারা মুশরিক। তাই আমাদের শিক্ষিত যুবকদের কোরআনের আলোকে বিষয়টা খুব ভাল করে যাচাই করে দেখা একান্ত উচিত। ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারী পরিবারের জন্য এক জ্বলন্ত অভিশাপ। বিধর্মী বিয়ের অন্যান্য সামাজিক বহু অসুবিধা তো রয়েছেই।

٨٠ : ٧ــ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ٥

٨١ : ٧ــ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ٥ (سورة الاعراف - پ - ٨ - ركوع ١٠)

৭ : ৮০— লূতকেও পাঠানো হয়; তখন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, "বিশ্বজগতে যে পাপ কোনো জাতি করেনি, তোমরা কি সেই পাপে[২২] লিপ্ত হয়ে থাকবে?

৭ : ৮১— নিশ্চয়ই তোমরা নারীদের পরিবর্তে পুরুষের সঙ্গে যৌন-মিলনে প্রবৃত্ত আছ; সুতরাং তোমরা (দ্বীনের) এক সীমা লঙ্ঘনকারী[২৩] জাতি।

(সূরা আরাফ, ৮ম পারা, ১০ম রুকু)

২২. এখানে বলা হয়েছে, হযরত লূত (আ.)-এর জাতি সমমৈথুন তথা পুং-মৈথুনে এতটা অভ্যস্ত ছিল যে, তারা নারীদের পরিবর্তে পুরুষকেই যৌন-সঙ্গী হিসাবে বেশি পছন্দ করত। আল্লাহ একে অতি জঘন্য ও ঘৃণিত পাপ বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের পাপে আল্লাহ 'সডোম' শহরের লোকদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। তাই পুরুষের সম-মৈথুনকে আজও সডোমি (Sodomy) বলা হয়।

২৩. যারা এরূপ সম-মৈথুন করে তারা কঠিন পাপী এবং কোরআনের ভাষায় সীমালঙ্ঘনকারী। যারা ইসলামী পর্দা মানে না তাদের অনেকে বলে, নর-নারীর অবাধ মেলামেশার অভাবেই এ অভ্যাস দেখা দেয়, কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নয়।

সম্প্রতি বৃটিশ আইন-সভা (১৯৬৫) এ জঘন্য পুং-মৈথুনকে আইনসিদ্ধ করে আইন পাস করেছে। বাইবেলে একে ঘৃণা করা সত্ত্বেও ক্যান্টারব্যারীর বিশপ এ বিলে সম্মতি দিয়েছেন, কারণ তাদের বাইবেল আজ অতি বেশি

বিকৃত, তাই মূল্যহীন। তাই এ জঘন্য ও ঘৃণিত যৌন বিকৃতি পাশ্চাত্য খ্রিস্টান জগতে আইনসিদ্ধ!

এখানে প্রশ্ন হলো, পাশ্চাত্য দেশসমূহে, বিশেষ করে ব্রিটেনে নর-নারীর ব্যাপক ও অবাধ ব্যভিচার সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা সত্ত্বেও পুং-মৈথুন সমর্থন করে আইন পাস করার প্রয়োজন হলো কেন? চিন্তা করে দেখা উচিত, কেন সহজলভ্য নারী থাকা সত্ত্বেও পুরুষ অন্য পুরুষে কামাসক্ত হয়? ইসলামী পর্দা ত্যাগ করায় আজ এ যৌন-বিকৃতির বিকাশ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এ সমস্যা খুব প্রকট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পশুর মতো নর-নারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিলে সম-মৈথুন জাতীয় নানারূপ যৌন-বিকৃতি, পতিতাবৃত্তি ও জঘন্য অশ্লীলতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেসব পুরুষ যৌন প্রতিযোগিতায় হেরে যায়, তারা নিজেদের মধ্যে সম-মৈথুনের সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইসলামী বিবাহ-প্রথা প্রবর্তন করলে এবং যুবক যুবতীদের মধ্যে বিবাহ-পূর্ব অবাধ মেলামেশা বন্ধ করলে সম-মৈথুনের মতো জঘন্য ও ঘৃণিত বিকৃতি হ্রাস পেতে বাধ্য।

সম্প্রতি USA এবং U. K. সহ প্রায় সকল পাশ্চাত্য দেশে এ সমকামীদের মধ্যে AIDS (Acquired Immune deficiency Syndrome) নামক এক মারাত্মক রোগ দেখা দিয়েছে। ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার লোক এ রোগে মারা গেছে, যার প্রায় ৮০% সমকামী। সমগ্র পাশ্চাত্য জগত এখন এ রোগের ভয়ে ভীত। এ যেন আল্লাহর গজবের নমুনা।

৩২ : ১৭ — وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط
وَسَاءَ سَبِيْلًا ○ (سورة بنى اسراء يل — پ ١٥ — ركوع ٤)

১৭ : ৩২— তোমরা ব্যচিারের নিকটবর্তী হয়ো না; কারণ এটা অতি লজ্জাজনক ও গুনাহর কাজ, যা আরো গুনাহর পথ খুলে দেয়[২৪]।

(সূরা বনী ইসরাঈল, ১৫শ পারা, ৪র্থ রুকু)।

২৪. আল্লাহ জ্বেনা হারাম করেই ক্ষান্ত হননি; বরং জ্বেনার নিকটবর্তী হওয়া বা ব্যভিচারের পরিবেশ সৃষ্টিও হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে সমস্ত যৌন-উত্তেজক ব্যবস্থা রয়েছে তার সবই হারাম। বর্তমানে আর্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে নর-নারীর অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা করা হয়েছে; অশ্লীল সিনেমা, থিয়েটার, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক তথাকথিত সংস্কৃতির

নামে নর-নারীর মিলিত নাচ-গানের আসর, সহশিক্ষা ও ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের জিনিসপত্র (কনডম ও প্লাস্টিক কয়েল ইত্যাদি) বিবাহের প্রমাণ ছাড়াই পাওয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে জেনার শত দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। আশা করি চিন্তাশীল মুসলিম সমাজ নেতারা এ সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং সমাজকে ব্যভিচারের মতো আত্মধ্বংসকারী পাপ থেকে বাঁচার পথ দেখাবেন।

٣٢ : ٢٤ ــ وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ (سورة النور ــ پ ١٨ ــ ركوع ٤)

২৪ : ৩২ — তোমাদের (স্বাধীন) মধ্যে যারা একা (অবিবাহিত)[২৫] এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাদেরকে বিয়ে দাও[২৬]। যদি তারা গরীব হয় তবে আল্লাহ নিজের মহিমায় তাদেরকে অভাবমুক্ত[২৭] করে দেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ দাতা ও জ্ঞানী। (সূরা আন নূর, ১৮শ পারা, ৪র্থ রুকু)

২৫. ইসলাম কোনো অবস্থায়ই যৌন-ব্যভিচার অনুমোদন করে না। ব্যভিচার দূর করা ইসলামী সমাজব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বিয়ের বয়স হলে বিয়ে করা সেই ব্যবস্থারই মূলনীতি। আজকাল বিলম্বে বিয়ে করার যে রেওয়াজ প্রচলিত, তার প্রত্যক্ষ ফল ব্যভিচারের ব্যাপক প্রসার অথবা সমাজে ব্যভিচার সহজ বলেই অনেকে দেরিতে বিয়ে করতে চায়। কারণ বিয়ের সঙ্গে বহু দায়িত্বভারও জড়িত। সুস্থ নর-নারীদের এ দায়িত্ব বহন করতে হবে; বুদ্ধদেব বা বিবেকানন্দের মতো নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না। চিরকৌমার্য মানব জীবনে স্বাভাবিক নয়।

২৬. দাস-দাসী তথা চাকর-চাকরানীদের যারা বিবাহযোগ্য ও স্বাস্থ্যবান তাদেরকে বিয়ে দিতে বলা হয়েছে, তা নাহলে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এসব বিষয়ে সাবধান না হলে পরিবারেও ব্যভিচার প্রসার লাভ করে।

২৭. দারিদ্রের দোহাই দিয়ে অনেক উপার্জনশীল যুবকও আজকাল বিয়ে করতে বিলম্ব করে। এরা যে সবাই যৌন বিষয়ে খুব সংযমী তা জোর দিয়ে বলা মুশকিল, কিন্তু যদি তারা জেনা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশে বিয়ে করে, তবে আল্লাহ তাদের অবস্থার উন্নতি করে দেবেন বলে এ আয়াতে ওয়াদা করছেন। মনে রাখা দরকার, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যোগার ব্যবস্থার প্রকৃত মালিক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। সত্যি সত্যি দারিদ্রের জন্য যারা বিয়ে করতে পারে না তাদেরকে চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে (২৪ : ৩৩) এবং এর ফলে আল্লাহ অভাবমুক্ত করার ওয়াদা করেছেন।

٥٩ : ٢٣ ـ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٥

(سورة الاحزاب ـ پ ٢٢ ـ ركوع ٨)

৩৩ ঃ ৫৯ — হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের ও কন্যাদের এবং (অন্য) মুমিন নারীদের বলুন যেন (বাইরে যাওয়ার সময়) তারা সারা শরীর চাদরাবৃত করে নেয়, এটা তাদেরকে চিনে নিতে সহজ করে দেবে এবং তারা অপমানিত হবে না[২৮] : নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দয়াময় ও ক্ষমাশীল।

(সূরা আল আহযাব, ২২শ পারা, ৮ম রুকু)

৩৮. এটা হচ্ছে পর্দা বিষয়ক অন্যতম প্রধান আয়াত ২৪ : ৩০ ও ৩১ আয়াতেও পর্দা সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এখানে মেয়েদেরকে বাড়ির বাইরে যাবার সময় একটি বহিরাবরণ (চাদর বা বোরকা) মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যবহার করতে আদেশ দেয়া হচ্ছে। এ আয়াত দ্বারা পর্দা করা অর্থাৎ চাদর বা বোরকা পরা ফরজ প্রমাণিত হয়।

পর্দার উপকারিতা সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, বহিরাবরণ সহজেই মুসলিম নারীদেরকে চিনে নিতে সাহায্য করবে; আর পর্দানশীল নারীদের প্রতি

কোনোরূপ দুর্ব্যবহার করার সাহস দুর্বৃত্তদের থাকে না। একথা সর্বজনবিদিত যে, গুণ্ডা, বদমায়েশরা বেপর্দা বা অশালীন (দেহের সৌন্দর্য প্রকাশক) পোশাক পরিহিতা নারীদের প্রতিই দুর্ব্যবহার বা অশ্লীল ইঙ্গিত করে থাকে। পর্দা মেয়েদেরকে সম্ভ্রান্ত, সতী-সাধ্বী ও শালীনতাময় করে তাদের সম্মানের পাত্রী করে তুলতে সাহায্য করে।

আধুনিকতার দোহাই দিয়ে পর্দার বিরোধিতা করলে ফরজ ত্যাগ করার ন্যায় কবীরা গুনাহ হবে। নারী স্বাধীনতার নামে মেয়েদেরকে বেপর্দা করে খেলার পুতুল ও ভোগের সামগ্রী করে তাদের বিকৃত অবাধ যৌন-লালসা চরিতার্থ করছে মাত্র। চিন্তাশীল নারীদেরকে এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং সমাজের বেপর্দা নারীদের শেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ করতে অনুরোধ জানাই। আর সেই সঙ্গে সবাই যেন একথাও স্মরণ রাখেন, আল্লাহর সকল বিধান মানবের অশেষ কল্যাণের জন্য।

কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা

সম্প্রতি মিসরবাসী ড. রাশাদ খলিফা আমেরিকায় কম্পিউটারের সাহায্যে পবিত্র কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা আবিষ্কার করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল সকলকে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। নিম্নে ড. রাশাদের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই মোজেযার বিবরণ দেয়া হল।

এক : কোরআনের সর্বপ্রথম আয়াত হল بسم الله الرحيم আর এই আয়াতে মোট উনিশ (১৯) টি অক্ষর রয়েছে। এই সংখ্যা একটা বাস্তব সত্য, যা কোনো ব্যক্তি অতি সহজেই গুনে দেখতে পারেন। সমগ্র কোরআনে এই প্রথম আয়াতের চারটি শব্দ— اسم (Ism), الله (Allah), الرحمن (Al Rahman) ও الرحيم (Al Raheem) যতবার আছে তা এ উনিশ দ্বারা বিভাজ্য। সমগ্র কোরআনে اسم শব্দ মাত্র ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। الله শব্দ ২৬৯৮ (১৯ × ১৪২) বার, الرحمن মাত্র ৫৭ (১৯ × ৩) বার এবং الرحيم মাত্র ১১৪ (১৯× ৬) বার ব্যবহৃত হয়েছে, আর এ সংখ্যাগুলোর প্রত্যেকটিই ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। এ সংখ্যাগুলোর সত্যতাও যে কেউ গুনে যাচাই করে দেখতে পারেন।

ইতিপূর্বে অনেকেই শব্দসহ কোরআনের বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশ করেছেন এবং তারাও এ শব্দগুলোর একই সংখ্যা পেয়েছেন, তবে এর সঙ্গে বিসমিল্লাহ শরীফের অক্ষর সংখ্যা ১৯-এর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ লক্ষ্য করেননি। এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত পুস্তকে এ শব্দগুলোর সংখ্যা রয়েছে ১৯, ২৬৯৭ ৫৭ ও ১১৪ বার, কিন্তু কম্পিউটারে গুনে দেখা গেল, الله শব্দ প্রকৃতপক্ষে ২৬৯৮ বার রয়েছে। পরে যাচাই করে দেখা গেল, লেখক গুনতিতে ভুল করেছিলেন। এখানেও লেখক বিসমিল্লাহ শরীফ বাদ দিয়ে বাকি কোরআনে الله শব্দ গুনেছেন। এতে বুঝা যায়, এ শব্দগুলোর ১৯ বা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হিসেবে ব্যবহারে করা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে; আর কোরআনের প্রতিটি শব্দও স্বয়ং আল্লাহই বেছে নিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যন্ত্রের সাহায্যে নির্ভুল

গণনায় দেখা গেল, মানুষের গণনায় ভুল হলেও কোরআনের শব্দ চয়নের একটা বিশেষ হিসাব রয়েছে। এখন একথা অকাট্য সত্য, কোরআনের প্রথম আয়াত ১৯টি অক্ষর, আর এ আয়াতের চারটি শব্দ সমগ্র কোরআনে ১৯ বা ১৯ এর দ্বারা বিভাজ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।*

যারা এ ধরনের হিসাবকে কোনো গুরুত্ব দিতে নারাজ তারা বলতে পারেন, হয় এটা নেহায়েত ঘটনাচক্র (Sheer coincidence), না হয় মহানবী স্বয়ং ইচ্ছা করে এ শব্দগুলো এমনি সংখ্যায় ব্যবহার করেছেন। প্রথম ঘটনাচক্রের কথাই ধরা যাক। যে কোনো গ্রন্থের প্রথম বাক্যে যতগুলো শব্দ ও অক্ষর রয়েছে, গোটা গ্রন্থে সেই শব্দগুলো প্রথম বাক্যের অক্ষর সংখ্যার সমান বা তার বিভাজ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মত ঘটনাচক্র কল্পনাতীত। আর যদিও বা একটা দু'টো শব্দের বেলায় এমন পাওয়াও যায়, পর পর চারটি শব্দের বেলায় এরূপ পাওয়া শুধুমাত্র ঘটনাচক্র বলে উড়িয়ে দেয়া যুক্তিসঙ্গতও নয়, বিজ্ঞানভিত্তিকও নয়।

সন্দেহবাদীদের দ্বিতীয় যুক্তি হতে পারে, স্বয়ং মহানবী এ ধরনের পরিকল্পনা করেই কোরআন রচনা করেছেন। ইসলামবিরোধীরা কোরআনকে নবীজী তথা মানবরচিত বলার বহু চেষ্টা করেছে। এরূপ অভিযোগের প্রতিবাদে যা বলা যায় তা এত যুক্তিসঙ্গত, তাতে সকল সন্দেহবাদীরা তাদের ভুল স্বীকার করে নিতে বাধ্য। অবশ্য যারা কিছুতেই ঈমান আনবে না— সেসব আবু জাহল ও আবু লাহাবদের কথা স্বতন্ত্র।

(ক) একথা সর্বজনস্বীকৃত, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নিরক্ষর ছিলেন; সুতরাং তাঁর পক্ষে আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। ইসলামবিরোধী খ্রিস্টান ও ইহুদী পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করেও নবীজীর উম্মী হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ আরোপ করতে সক্ষম হয়নি।

(খ) হাদীসে নবীজীর নিজস্ব ভাষা আর কোরআনের ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য যে কোনো আরবী ভাষাবিদের নিকট সুস্পষ্ট। একই ব্যক্তি— যিনি নিরক্ষর— তিনি এক মানের ভাষায় কথা বলবেন আবার আর এক মানের ভাষার কোরআনের আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, এটাও কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা হয় না। কথ্য ভাষা ও লিখিত ভাষায় পার্থক্য থাকতে পারে। তাই একজন লেখক যে ভাষায় কথা বলেন হয়তো বই লেখার সময় উন্নত ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু নিরক্ষর নবী তো কোনো বই রচনা করেননি বা কোরআনও

---

* Muhammad Fuad Abdul Baqi Index to the words of the Glorious Quran, Dar Ihiace Al-Turath Al Araby, Lebanon. Distributor : Islamic Book Service, P. Q. Box-38, Plainfield, Indiana 46168, U. S. A.

লিখিতভাবে নাযিল হয়নি। তাঁর মুখের ভাষা ও কোরআনের ভাষা উভয়টাই শুদ্ধতার দিক দিয়ে একরূপ হলেও ভাষার গাম্ভীর্য, অলংকার-বিন্যাস ইত্যাদির দিক দিয়ে কোরআনের আয়াতসমূহ অনেক উন্নতমানের। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি এরূপ দু'মানের ভাষায় কথা বলতে পারে না। যদি কোরআন কবিতার পুস্তক হতো তবুও তর্ক করা যেত। সুতরাং এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(গ) কোরআন সুদীর্ঘ তেইশ বছরে খণ্ডে খণ্ডে বা আংশিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি কোরআন নবীজীর নিজস্ব রচনা হতো, তবে বলতে হয়, সে যুগে এ নিরক্ষর আরব আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, তাঁর বইয়ের প্রথম বাক্যে মোট ১৯টি হরফ থাকবে আর তাতে চারটি শব্দ থাকবে এবং এ চারটি শব্দ সমগ্র গ্রন্থে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যায় ব্যবহৃত হবে। এ ধরনের যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর। তবুও যুক্তির খাতিরে যদি কেউ গোঁড়ামি করে বলেন, তিনিই এভাবে কোরআন রচনা করেছেন। তবে প্রশ্ন উঠে, তিনি তাঁর এমন চমৎকার সাহিত্যিক গৌরব তাঁর সাহাবাদের নিকট প্রকাশ করে নিজের গৌরব বৃদ্ধি করলেন না কেন? শুধু তাই নয়, স্বয়ং নবীজী বা তাঁর কোনো সাহাবা কোনো দিন কোরআনের এ সংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা তো বলেননি, এমন কি ১৯৭৬ সালের জুন মাসে ড. রাশাদ খলিফার এ আবিষ্কারের পূর্বে এ বৈশিষ্ট্যের কথা কেউ কোনো দিন উল্লেখও করেননি। সুতরাং আমরা সহজেই এরূপ সন্দেহ বাতিকদের তর্ক উপেক্ষা করতে পারি। এরপর আমরা নিঃসন্দেহ, এরূপ সংখ্যাতত্ত্বের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, যিনি এ কোরআন উম্মী নবীর উপর নাযিল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গোটা কোরআনের প্রতিটি শব্দই আল্লাহর রচিত ও নির্ধারিত।

দুই : কোরআনে মোট সূরার সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। যদিও প্রতিটি সূরার প্রথমেই 'বিসমিল্লাহ' রয়েছে, তবুও নবম সূরা— সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' নেই। আর নবীজীর নির্দেশেই এ সূরা বিসমিল্লাহ ছাড়া পাঠ করা হয়। যদি এ সূরা পৃথক না হয়ে বিসমিল্লাহ না থাকায় ৮ম সূরায় শামিল থাকতো, তবে সূরার সংখ্যা ১১৩ হতো যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়, কিন্তু নবীজী নিজেই সূরা তওবা বিসমিল্লাহ বাদে পৃথক সূরা হিসাবে পাঠ করে শুনিয়েছেন, সুতরাং কোরআনের সূরার সংখ্যা ১১৪ হওয়াও আল্লাহর নির্দেশ।

তিন : বিসমিল্লাহর অক্ষর সংখ্যা ১৯ হওয়ার আরও চমৎকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে কোরআনে প্রথম আয়াতের অক্ষর সংখ্যা ১৯, সে আয়াতটিও সমগ্র কোরআনে মোট ১১৪ (১৯ × ৬) বার ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি, কোরআনে সূরার সংখ্যা ১১৪ আর সূরা তওবা বাদে ১১৩টি সূরার শুরুতেই

বিসমিল্লাহ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি প্রত্যেক সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ থাকত তবে এ আয়াতের সংখ্যাও ১১৪ হতো। এখন সূরা তওবায় এ আয়াত না থাকায় এর সংখ্যা ১১৩ হলে তা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য হয় না কিন্তু সূরা নমলের ৩০ নং আয়াতে বিসমিল্লাহ শরীফ নাযিল হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে—

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ (٢٩) اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣٠) اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ (٣١)

সুতরাং সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না থাকায় সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের সংখ্যা ১১৪, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। মনে রাখা প্রয়োজন, কোরআনের প্রতিটি আয়াত কোনো সূরার এবং কোনো আয়াতের পর পাঠ করতে হবে এসবই হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পৌঁছানো নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছে। আর একই নির্দেশে অর্থাৎ আল্লাহর সুনির্দিষ্ট হুকুমেই সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না দিয়ে এ ব্যতিক্রম করা হয়েছে, অথচ প্রতিটি ছোট বড় সূরায় প্রথমে বিসমিল্লাহ রয়েছে। অবশ্য অন্য সূরার বদলে সূরা তওবায় কেন এ ব্যতিক্রম করা হল তা আল্লাহই ভাল জানেন। এখন বুঝা গেল, বিসমিল্লাহর ১৯টি অক্ষরের তাৎপর্য কত ব্যাপক। আজ চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক কোরআন শরীফেই সূরা তওবায় বিসমিল্লাহ বাদ দিয়ে ছাপানো হচ্ছে ও তেলাওয়াত হচ্ছে। বলা যায়, এ আয়াতের সংখ্যা ১১৪ ১৯ দ্বারা বিভাজ্য রাখার জন্যই একটি সূরায় এ ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এতদিন এ ব্যতিক্রমের কারণ এই ছিল, নবীজী বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) এরূপভাবে পড়তে বলেছেন। বর্তমান গবেষণায় বুঝা গেল, এর নতুন তাৎপর্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর। যদি এ ব্যাপারে কারো মনে সূরা তওবা পৃথক সূরা হওয়ার বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ থাকে, নতুন সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব অনুযায়ী সেরূপ কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকল না। এটা নিঃসন্দেহ, নবীজী আল্লাহর নির্দেশেই সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়েননি এবং এর ফলেই কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল।

মনে রাখা প্রয়োজন, যদি প্রতি সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ থাকত তবে সূরা নমলের ৩০ নং আয়াতের বিসমিল্লাহসহ এ আয়াতের সংখ্যা হতো ১১৫, যা ১৯

দিয়ে বিভাজ্য নয়। আবার সূরা নমলের আয়াতে বিসমিল্লাহ না থাকলে কোরআনে اسم শব্দের সংখ্যা ১৯ না হয়ে ১৮ হতো। অতীতে কোরআনের কোনো শব্দের রদ-বদল হয়নি, এ সংখ্যাতত্ত্ব সে কথাই প্রমাণ করে। আর এ হিসাব প্রকাশের পর ভবিষ্যতে কারো পক্ষে কোরআনের কোনো শব্দের রদবদল করা সম্ভব হবে না। মনে হয় কোরআন অবিকৃত রাখার জন্য এটাও অন্যতম ব্যবস্থা।

চার : সংখ্যা হিসেবে ১৯-এর গুরুত্বও লক্ষ্য করার মতো। এ সংখ্যার প্রথম 'এক' আর শেষ 'নয়', অর্থাৎ অঙ্কের প্রথম ও শেষ রাশি। আল্লাহ তায়ালা এক অদ্বিতীয়, আবার তিনিই প্রথম ও শেষ (اول واخر)-এ ছাড়া ১৯ একটি মূল সংখ্যা (prime number), যা অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য নয়। অর্থাৎ এর কোনো অংশী নেই বা বিভাগ নেই। আর আল্লাহও হলেন লা-শরীক। আবার ১৯-এর রাশি দু'টোর যোগফল ১০ (১ + ৯ = ১০), যার মূল্যহীন শুন্য বাদ দিলে রয়ে যায় এক, আর আল্লাহ এক অদ্বিতীয়।

পাঁচ : পবিত্র কোরআনে ১৯ সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সূরা আলমুদ্দাসসির (৭৪ নম্বর সূরা)-এর ৩০ নং আয়াতে এ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। এর পূর্ববর্তী আয়াতে (৭৪ : ২৪-২৫) কোরআনকে মানুষের রচনা বলার প্রতিবাদে আল্লাহ ৭৪ : ৩০ আয়াতে ১৯-এর উল্লেখ করেছেন এবং ৭৪ : ২৬-৩১ আয়াতে এরূপ অবিশ্বাসীদের কঠিন শাস্তি দেয়ার ধমক দেয়া হয়েছে। আল্লাহ এরশাদ করেছেন :

فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ (٢) اِنَّ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ
الْبَشَرِ(٢) سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَآ اَدْرٰئكَ مَا سَقَرُ
(٢<) لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا
تِسْعَةَ عَشَرَ (٢٠)

অর্থাৎ— (কাফের) বলল— এটা (কোরআন) শুধু লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত যাদু এবং এটা তো কেবল রচিত বাণী। আমি তাকে (কাফেরকে) 'সাকারে' নিক্ষেপ

করব, তুমি কি জান 'সাকার' কী? সাকার তাকে জীবিত অবস্থায়ও রাখবে না, আবার মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না। তা গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে আর তার উপর (সাকারের) থাকবে ঊনিশ।

৭৪ ঃ ৩১ আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً ص وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لا وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ (٣١)

অর্থাৎ— আমি ফেরেশতা ছাড়া কাউকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করিনি। কাফেরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি, যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্ববাসীদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং বিশ্ববাসী ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা (মোনাফেকরা) ও কাফেররা বলবে, "আল্লাহ্ এ অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন?" এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের বর্ণনাতেই মানুষের জন্য সাবধান বাণী রয়েছে।

এ আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায়, যারা এ কোরআনকে মানব রচিত বলবে এবং আল্লাহর নাযিল করা কিতাব মনে করবে না, তাদেরকে আল্লাহ্ সাকার নামক জাহান্নামে কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তদুপরি থাকল ঊনিশ। এতে

জাহান্নামে পাহারারত ১৯ জন ফেরেশতা ছাড়া আরও গভীর অর্থ রয়েছে মনে হয় এবং উনিশের সংখ্যাভিত্তিক কোরআনী মোজেযাও বুঝা যেতে পারে। এ মোজেযা দ্বারা প্রমাণ হয়, কোরআন মানব রচিত নয়। আর এ প্রমাণের জন্য উনিশভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ মনে হয়। এ ছাড়া ৭৪ : ৩১ আয়াতে রয়েছে ماذا اراد الله بهذا مثلا [অর্থাৎ আল্লাহ এরূপ (উনিশের) উদাহরণ দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন?] এর মানে হল, কাফেররা এ উনিশের উল্লেখে কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হবে মাত্র, কিন্তু এতে মুমিনদের ঈমান আরও দৃঢ় হবে। উনিশের এ নতুন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের মনে হয়, কোরআনের এ ১৯ ভিত্তিক সংখ্যাতাত্ত্বিক মেজেযা কাফেরদেরকে আরও বিভ্রান্ত করবে, আর মুমিনদেরকে দেবে কোরআনের প্রতি আরও গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

ছয় : যদি কোরআনের আয়াতসমূহের ক্রমানুসারে নাযিলের দিকে লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যায়, সর্বপ্রথম 'আল-আলাক' সূরার (৯৬) প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এ সূরা কোরআনের শেষ দিক থেকে উনিশতম (19th) এবং সূরার আয়াতের সংখ্যাও উনিশ। দ্বিতীয়বার নাযিল হল আল-কালামের (৬৮) কয়েকটি আয়াত, তৃতীয়বার নাযিল হল সূরা আল-মুযযাম্মিল (৭৩)-এর প্রথম কয়েক আয়াত এবং চতুর্থবার নাযিল হল সূরা আল-মুদাসসির (৭৪)-এর প্রথম থেকে ৩০ নং আয়াত, যার শেষ শব্দ تسعة عشر (উনিশ)। এরপর কোরআনের সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ সূরা আল-ফাতিহা নাযিল হয়, যার প্রথম আয়াতই হল ১৯টি অক্ষরযুক্ত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' এ আয়াতের অক্ষর সংখ্যা উনিশ হওয়ায় মনে হয় সূরা মুদ্দাসসিরে উনিশ সংখ্যার উল্লেখ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় কোরআন অবিকৃত রাখার জন্য এ সংখ্যাতাত্ত্বিক ভিত্তিও অন্যতম ব্যবস্থা। এখন যে কেউ কোরআনে কোনো নতুন শব্দ যোগ করলে বা বাদ দিলে তা ধরে ফেলা সহজ হবে।

সাত : কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, কতগুলো সূরার প্রথমে এক বা ততোধিক হরফ দিয়ে শুরু হয়েছে, আর এ হরফ বা হরফসমষ্টিকে পূর্ণ আয়াত ধরা হয়। এ হরফসমষ্টিকে বলা হয় حروف مقطعة বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ। এ ধরনের হরফের আয়াত কোরআনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অন্য কোনো গ্রন্থে এরূপ হরফের ব্যবহার দেখা যায় না। নবীজীও এ হরফগুলোর কোনো অর্থ বলে যাননি। যদিও এগুলো কোরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাঠ করা হয়। কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা আলোচনায় এ সমস্ত বিচ্ছিন্ন হরফের নতুন

তাৎপর্য পাওয়া যাচ্ছে, যদিও এগুলোর অর্থ আমাদের বোধগম্য নয়, কারণ আল্লাহ্ তায়ালা এগুলো এমনিভাবে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবার এ সকল হরফের বিশেষ তাৎপর্যসমূহ আলোচনা হবে।

কোরআনের মোট ২৯টি সূরার প্রথমে এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের হরফের মোট সংখ্যা ১৪টি। যেমন :

ا - ح - ر - س - ص - ط - ع - ق - ك - ل - م - ن - ه - ى

আলিফ, হা, রা, সিন, সাদ, ত্বা, আইন, ক্বাফ, কাফ্, লাম, মীম, নুন হা এবং ইয়া। আবার এ ১৪টি হরফ এভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মোট ১৪ প্রকারে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

ق - ن - ص - طه - يس - طس - حم - الم - الر -
طسم - عسق - المر المص - كهيعص ٥

যে ২৯টি সূরার প্রথমে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে— তাদের নম্বর ২, ৩, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১,৫ ১৯, ২০, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫০ এবং ৬৮।

সুতরাং ২৯টি সূরার ১৪টি হরফ ১৪ প্রকারে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ তিনটি সংখ্যার সমষ্টি ৫৭, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (২৯+১৪+১৪ = ৫৭ = ১৯ × ৩)।

(ক) এক অক্ষরবিশিষ্ট সূরাগুলোর আলোচনা :

(i) ق (কাফ)– সূরা কাফ (৫০)-এর প্রথমে এই কাফ অক্ষর এককভাবে এবং সূরা 'আশশূরায়' (৪২) حم (٢) عسق ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে حم একটি আয়াত ও عسق আর একটি আয়াত, অর্থাৎ حم ও عسق দুটি পৃথক হরফসমষ্টি।

সূরা ক্বাফে অক্ষরের মোট সংখ্যা ৫৭, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যে কেউ কয়েক মিনিটে এটা গুণে দেখতে পারেন। এমনিভাবে সূরা আশ শূরায়ও ক্বাফ অক্ষরের সংখ্যা ৫৭ (১৯ × ৩ = ৫৭), অথচ এ সূরা সূরা ক্বাফ-এর দ্বিগুণের চেয়েও বেশি দীর্ঘ। এ দুই ক্বাফ সম্বলিত সূরায় মোট ক্বাফ-এর সংখ্যা ১১৪ যা কোরআনের মোট সূরা সংখ্যার সমান ও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। যদি ক্বাফ হরফটি কোরআনের প্রতীক হয়ে থাকে, তবে দুই সূরায় এ হরফের মোট সংখ্যা সমগ্র কোরআনের সূরার সংখ্যার সমান হওয়া বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায়।

এখন দুই সূরায় ৫৭টি করে ক্বাফ হরফ থাকার পেছনে কোনো মহা পরিকল্পনা রয়েছে, না এটাও ঘটনাচক্র। সূরা ক্বাফ-এর ত্রয়োদশ আয়াতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে হযরত লূত (আ.)-এর জাতিকে قوم لوط না বলে اخوان لوط বলা হয়েছে। সমগ্র কোরআনে হযরত লূত (আ.)-এর জাতি উল্লেখ করা হয়েছে মোট ১২ বার— ৭ : ৮৩; ১১ : ৭০, ৭৪, ৮৯; ২২ : ৪৩; ২৬ : ১৬০; ২৭ : ৫৪, ৫৬; ২৯ : ২৮; ৩৮ : ১৩; ৫০ : ১৩ এবং ৫৪ : ৩৩ আয়াতসমূহে এবং একমাত্র ৫০ : ১৩ আয়াত ছাড়া বাকি ১১টি আয়াতে قوم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ আয়াতে اخوان বলা হয়েছে। এ ব্যতিক্রম না হলে সূরা ক্বাপে একটি ক্বাফ বেশি হতো এবং এ ১৯ ভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব ব্যর্থ হতো। যদিও 'কাওম' ও 'এখওয়ান' দু'টি শব্দই সমার্থবোধক, তবু আরবি অক্ষরের বেলায় এতে ق হরফের সংখ্যা তারতম্য হয়। সুতরাং এ ব্যতিক্রম না হলে দু'টি ق ওয়ালা সূরার মোট কাফ-এর সংখ্যা কোরআনের মোট সূরা সংখ্যা (১১৪)-এর সমান হতো না এবং তা ১৯ দিয়ে বিভাজ্যও হতো না। মনে হয়, এ ১৯ ভিত্তিক হিসাব বজায় রাখার জন্যেই এ আয়াতে قوم না বলে اخوان বলা হয়েছে; যদিও সমগ্র কোরআনে আরও এগার বার একই বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে قوم শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। একে নিছক ঘটনাচক্র বলা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়।

(ii) হরফ ن (নুন)-সূরা আল-কালাম (৬৮)-এর প্রথমে এ হরফটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূরায় গবেষণাকারী কম্পিউটারের সাহায্যে গুণে নুন হরফের সংখ্যা পেয়েছেন ১৩৩, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯ × ৭ = ১৩৩)। কোরআনের প্রাচীন কপিতে এ সূরার শুরুতে ن অক্ষরটি نون রূপে লেখা ছিল। সুতরাং এখানে দু'টি ن অক্ষর রয়েছে ধরে হিসাব করতে হবে।

(iii) ص (সাদ) হরফ কোরআনের তিনটি সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন অক্ষর ص রয়েছে ঃ সূরা আল-আরাফ (৭)-এ لمص অক্ষরসমষ্টির অংশ হিসেবে, সূরা মরিয়ম (১৯)-এ كهيعص অক্ষরসমষ্টির অংশ হিসেবে এবং সূরা সাদ (৩৮)-এ শুধু ص অক্ষর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ তিনটি সূরায় 'সাদ' অক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৮, ২৬ এবং ২৮, যার যোগফল ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৯৭ + ২৬ + ২৯ = ১৫২ = ১৯ × ৮)।

সূরা আ'রাফের (৭) ৬৯ নং আয়াতে بصطة বলে একটা শব্দ রয়েছে, যা ص দিয়ে লেখার হুকুম দিয়েছেন স্বয়ং মহানবী (সঃ)। যদিও আরবী ভাষায় এ শব্দটি লেখার নিয়ম س-এর সাহায্যে (بسطة)। হযরত জিবরাঈলের নির্দেশে মহানবী এ শব্দটি কোরআনে ص দিয়ে লেখে س-এর মত উচ্চারণ করতে বলে গেছেন। সেই থেকে এ শব্দটি কোরআন শরীফে ص দিয়ে লেখে তার উপরে ছোট্ট করে س লেখে রাখা হয়। কারী সাহেবেরা بصطة-এর ص কে س-এর মতো উচ্চারণ করতে শিক্ষা দেন। যদি এ শব্দটি ص দিয়ে লেখা না হতো তাহলে ص চিহ্নিত সূরা তিনটিতে মোট 'সাদ' অক্ষরের সংখ্যা হত ১৫১ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। এতে কি মনে হয় না, এ ১৯ ভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব বজায় রাখার জন্যই আল্লাহ এ ধরনের বিশেষ বানানে এ শব্দটি লেখতে হুকুম দিয়েছেন? কোরআনকে অবিকৃত রাখার পরিকল্পনায় এ ১৯ ভিত্তিক মোজেযা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

(খ) দুই হরফবিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমষ্টি :

(i) طه এ হরফ দুটি একসঙ্গে কেবলমাত্র সূরা طه (২০)এর শুরুতে একটি আয়াত হিসেবে ব্যবহৃত। এ সূরায় ط-এর সংখ্যা ২৮ আর ه-এর সংখ্যা ৩১৪, যার যোগফল ৩৪২ (২৮ + ৩১৪ = ৩৪২ = ১৯ × ১৮), যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

এ ছাড়া আরও তিনটি সূরা— সূরা আশ শু'আরা (২৬), আন নমল (২৭) ও আল-কাসাস (২৮)-এ ط অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে طسم, طس ও طسم রূপে। সুতরাং মোট চারটি সূরা ط অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে— সূরা ২০, ২৬, ২৭ এবং ২৮, আর এ চার সূরায় ط হরফ রয়েছে যথাক্রমে ২৮, ৩৩, ২৭ এবং ১৯ বার, যার যোগফল ১০৭, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

আবার ه অক্ষর সূরা طه (২০) ছাড়া সূরা মরিয়মে (১৯)-ও ব্যবহৃত হয়েছে كهيعص হিসেবে। এ দুই সূরায় মোট ه অক্ষর যথাক্রমে ১৩৪ ও ৩৬৮ বার রয়েছে। যার যোগফল ৪৮২ বার। এখন طه সহ সকল সূরার সর্বমোট ط এবং ه সহ সূরা দ্বয়ের সকল ه হরফের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭ + ৪৮২ = ৫৮১ (১৯ × ৩১), যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(ii) طس এ অক্ষর দু'টি কেবল সূরা নমলের (২৭) শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বেই দেখানো হয়েছে, ط যুক্ত চারটি সূরায় মোট ط হরফের সংখ্যা

১০৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। এবার যত সূরায় س ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা ২৬, ২৭, ২৮, ৩৬ এবং ৪২— এ ৫টি সূরায়) — এগুলোতে মোট س-এর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৩, ৯৩, ১০০, ৪৮ এবং ৫৩ বার যার যোগফল ৩৮৭ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়, কিন্তু ط ও ه হরফের মতো সকল ط ও سه এর সংখ্যার যোগফল ৪৯৪ (১০৭ + ৩৮৭ = ৪৯৪ = ১৯ × ২৬) ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(iii) يس-এ দু'টি অক্ষর কেবল সূরা ইয়াসিনের (৩৬) শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূরা মোট ی হরফের সংখ্যা ২৩৭ এবং س হরফের সংখ্যামাত্র ৪৮ এবং এ দু'টো সংখ্যাই পৃথক পৃথকভাবে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়, কিন্তু এদের যোগফল (২৩৭ + ৪৮ = ২৮৫ = ১৯ × ১৫) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

উপরে বর্ণিত طه-এর মতো এখানেও অনুরূপ সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা লক্ষ্য করা যায়। ی হরফ সূরা ইয়াসিন (৩৬) ছাড়া সূরা মরিয়মে (১৯)-ও রয়েছে অক্ষর সমষ্টি كهيعص -এর অংশ হিসেবে। এ দু'টি সূরায় ی হরফের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩৭ এবং ৩৪৫, যা আলাদাভাবে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয় এদের যোগফল ৫৮২ (২৩৭ + ৩৪৫ = ৫৮২)-ও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। কিন্তু যে পাঁচটি সূরায় س রয়েছে তাদের মোট সংখ্যা ৩৮৭, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। এখন যে সকল সূরার শুরুতে ی ও س রয়েছে তাদের সকল ی ও س-এর সংখ্যা একত্রে দাঁড়ায় ৯৬৯ (৫৮২ + ৩৮৭ = ৯৬৯ = ১৯ × ৫১), যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(iv) حم -এ অক্ষর দু'টি সাতটি সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে (৪০ থেকে ৪৬) এবং এগুলোতে মোট ح রয়েছে ৩০৪ বার এবং م রয়েছে ১৮৬২ বার। طه এবং يس-এর মতো এখানেও এদের যোগফল ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৩০৪ + ১৮৬২ = ২১৬৬ = ১৯ × ১১৪)। তবে এ সাতটি সূরার মোট ح ও م হরফের সংখ্যা পৃথক পৃথকভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৩০৪ = ১৯ × ১৬ এবং ১৮৬২ = ১৯ × ৯৮)।

(গ) তিন অক্ষরবিশিষ্ট বিভিন্ন অক্ষর সমষ্টি ঃ

(i) طسم দু'টি সূরায় এ তিন অক্ষর সমষ্টি طسم ব্যবহৃত হয়েছে— সূরা আশ-শু'আরা (২৬) ও সূরা আল কাসাস (২৮)। এ দু'টি সূরায় (মীম) অক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮৯ এবং ৪৬১, যা আলাদাভাবে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়, কিন্তু এদের যোগফল ৯৫০ (৪৮৯ + ৪৬১ = ৯৫০ × ৫০) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

আগেই দেখানো হয়েছে, মোট চারটি সূরায় ط ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা ২০, ২৬, ২৭ এবং ২৮), তাদের একটিতে طه (২০) হিসেবে, একটিতে طس (২৭) হিসেবে এবং দু'টিতে طسم (২৬, ২৮) হিসেবে। এ চারটি সূরায় মোট ط হরফের সংখ্যা যথাক্রমে ২৮, ৩৩, ২৭ ও ১৯ এবং এদের যোগফল ১০৭, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। এবার যে পাঁচটি সূরায় (২৬, ২৭, ২৮, ৩৬, ৪২) س ব্যবহৃত হয়েছে তার একটিতে طس (২৭) হিসেবে, দু'টিতে طسم (২৬ এবং ২৮) হিসেবে, একটিতে يس (৩৬) হিসেবে এবং একটিতে عسق (৪২) হিসেবে। এসব সূরায় মোট হরফের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৩, ৯৩, ১০০, ৪৮ এবং ৪৩ বার, রয়েছে যার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে এবং এদের যোগফল ৩৮৭ উনিশ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

আবার م হরফ বিভিন্ন অক্ষরসমষ্টির অংশ হিসেবে মোট ১৭টি সূরায় রয়েছে এবং সব কয়টিতে মোট م-এর সংখ্যা ৮৬৮৩ বার, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৮৬৮৩ = ১৯ × ৪৫৭)। এখন সকল طس ও م অক্ষরযুক্ত সূরাগুলোতে এ তিনটি হরফের সংখ্যায় যোগফল ৯১৭৭ (১০৭ + ৩৮৭ + ৮৬৮৩ = ৯১৭৭ = ১৯ × ৭৮৩) ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(ii) الم এ তিনটি অক্ষরসমষ্টি মোট ৮টি সূরার প্রথমে রয়েছে (সূরা ২, ৩, ৭, ১৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২) এবং এসব কয়টি সূরায় মোট আলিফ রয়েছে ১২৩১২ বার, লাম রয়েছে ৮৪৯৩ বার এবং মীম রয়েছে ৫৮৭১ বার, যার লাম ও মীম-এর সংখ্যা আলাদাভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (৮৪৯৩ = ১৯ × ৪৪৭; ৫৮৭১ = ১৯ × ৩০৯)।

কিন্তু 'আলিফ' হরফ এ ৮টি সূরা ব্যতীত আরও ৭টি সূরাতেও ব্যবহৃত হয়েছে— ৫টি সূরায় الر হিসেবে, একটি সূরায় (৭) المص হিসেবে এবং একটি সূরায় (১৩) المر হিসেবে। এ সব সূরায় মোট আলিফের সংখ্যা ১৭৪৯৯ (১৯ × ৯২১), যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মোট ১৭টি সূরা প্রথম মীম (م) হরফ ব্যবহৃত হয়েছে, যার মোট মীমের সংখ্যা ৮৬৮৩ (১৯ × ৪৫৭), যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এমনিভাবে মোট লামের সংখ্যা (১৫টি সূরায়) হল ১১৭৮০ (১৯ × ৬২০) এবং এ সংখ্যাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আবার পূর্ববর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী এ তিনটি হরফের যোগফলও অবশ্যই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (৩৭৯৬২ = ১৯ × ১৯৯৮)।

(iii) الر —এ তিনটি অক্ষরসমষ্টি মোট ৫টি সূরায় (১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫) এসেছে। পূর্ববর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী শুধু এ ৫টি সূরায় অক্ষর তিনটির সংখ্যার যোগফল যদিও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়, কিন্তু সূরা রা'দের (১৩) (যা المر দিয়ে শুধু), ر ('রা') হরফের সংখ্যা এ সঙ্গে যোগ দিলে طه ،يس ও طسم-এর মতো এখানেও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। এ ৫টি সূরার ا- ل - م হরফত্রয়ের সংখ্যা ৯৫৭২ ও সূরা রা'দের ر হরফের সংখ্যা ১৩৭ এবং এদের যোগফল ৯৭০৯ (৯৫৭২ + ১৩৭ = ৯৭০৯ = ১৯ × ৫১১) উনিশের গুণফল।

(iv) عسق-এ তিনটি হরফসমষ্টি একমাত্র ৪২ নম্বর সূরা আশশুরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূরায় এ তিনটি হরফের মোট সংখ্যা মাত্র ২০৯, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯ × ১১ = ২০৯)। এ ছাড়া আর একটি মাত্র সূরায় (১৯) ع হরফ ব্যবহৃত হয়েছে— সূরা মরিয়মের শুরুতে كهيعص অক্ষরসমষ্টির অংশ হিসেবে। ১৯ ও ৪২ এ দুই সূরায় মোট ع হরফের সংখ্যা ২২১, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। পূর্বেই দেখানো হয়েছে, পাঁচটি সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট س-এর সংখ্যা ৩৮৭ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়), আর যে দু'টি সূরায় প্রথমে ق হরফ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট ق-এর সংখ্যা ১১৪, যা ১৯-এর গুণফল। এখন যেসব সূরার ع, ص ও ق হরফ ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের সকল ع, س ও ق হরফের সংখ্যার যোগফল (২২১ + ৩৮৭ + ১১৪ = ৭২২ = ১৯ × ৩৮ = ৭২২), যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(ঘ) চার অক্ষরবিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অক্ষর যুক্ত সূরা :

(i) المص -এ চারটি অক্ষর মাত্র সূরা আল আরাফ (৭)-এর প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সূরায় এ চারটি অক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫৭২, ১৫২৩, ১১৬৫ এবং ৯৮, যার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়, কিন্তু তাদের যোগফল ৫৩৫৮ (১৯ × ২৮২) ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(ii) المر -এ বারটি অক্ষর এক সঙ্গে কেবল সূরা আর-রা'দের (১৩) শুরুতে রয়েছে। এতে চারটি অক্ষরের সংখ্যা যথাক্রমে আলিফ ৬২৫ বার, লাম ৪৭৯ বার, মীম ২৬০ বার এবং রা ১৩৭ বার, যার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়, কিন্তু المص-এর মতো এদেরও যোগফল ১৫০১ (১৯ × ৭৯) ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

(ঙ) পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমষ্টি যুক্ত সূরা :

كهيعص -এ পাঁচটি অক্ষরসমষ্টি একমাত্র সূরা মরিয়ম (১৯)-এর শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো সূরায় পাঁচটি বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমষ্টির ব্যবহার নেই। এ পাঁচটি হরফ এ সূরায় যথাক্রমে ১৩৭, ১৬৮, ৩৪৫, ১২২ ও ২৬ বার রয়েছে, যার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়, কিন্তু এদের যোগফল ৭৯৮ (১৯ × ৪২) ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

এখন বুঝা যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন অক্ষরযুক্ত সূরাগুলোতে সেসব অক্ষরের সংখ্যার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই কোনো লেখকের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী রচিত হতে পারে না। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ পবিত্র কোরআনের রচয়িতা স্বয়ং মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা এবং সে জন্যই এরূপ অলৌকিক মোজেযা সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং কোরআনের প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহ শরীফের ১৯টি অক্ষরের সঙ্গে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন গাণিতিক সম্পর্ক খুবই বিস্ময়কর এবং কোরআন যে নবীজীর শ্রেষ্ঠতম মোজেযা, তারও একটি অকাট্য প্রমাণ। বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ না জানলেও ত

াদের এ নতুন বিশেষত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

এছাড়া আরও একটি বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোরআনের কতগুলো শব্দ লেখার পদ্ধতি বা বানান মহানবীর নির্দেশিত কোরেশী কায়দায় চালু বলে সেসব শব্দ সাধারণ আরবী সাহিত্যের বানান থেকে আলাদা। আজ চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত এ শব্দগুলো কোরআনে একইভাবে লেখা হচ্ছে এবং এর কোনোরূপ ব্যতিক্রম নাজায়েয বলে স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ সালাত, হায়াত ও যাকাত ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত সাহিত্যিক বানানে না লেখে কোরআনে যেভাবে লেখা হয় তাতে তাদের উচ্চারণ হয় সালাওয়াত, হায়াওয়াত ও জাকাওয়াত। অবশ্য কোরআনে এভাবে লেখা হলেও উচ্চারণ সালাত, হায়াত ও জাকাত-ই করতে হয়। এখন যদি

নবীর নির্দেশ অমান্য করে প্রচলিত সাহিত্যিক বানানে কোরআন লেখার অনুমতি থাকতো, তবে এ গাণিতিক হিসাব যা আমরা উপরে আলোচনা করলাম, তা সম্ভব হতো না।

এ বিষয়ে আরও একটি উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোরআনে বিসমিল্লাহ শব্দ লেখা হয় (بسم الله) ب হরফের পর س হরফ লেখে, কিন্তু প্রকৃত শব্দটি হল باسم অর্থাৎ ب হরফের পর اسم দিয়ে লেখা, কিন্তু নবীজীর নির্দেশে এ শব্দটি بسم লেখা হচ্ছে, আর তা না হলে বিসমিল্লাহ-র অক্ষর সংখ্যা উনিশ না হয়ে বিশ হত, আর এ গাণিতিক মোজেযার মূল কাঠামোই ভেঙ্গে পড়তো।

সুতরাং এ সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা থেকে বুঝা যায়, যুগে যুগে আল-কোরআন এমনিভাবে মানুষকে তার অলৌকিকত্বের আরও অনেক পরিচয় দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সমাপ্ত

ISBN 984-8747-80-X

